জোড়া ইস্পাতে রং

দেবেন্দ্র মৈত্র

সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী

১৫/৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশিকা : কাবেরী মৈত্র
কাজীপাড়া
কলিকাতা-৩২

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র—১৩৫৭
প্রচ্ছদ : সব্যসাচী দাশগুপ্ত

মুদ্রক: শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স
৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা-৬

শ্রদ্ধেয়া 'বড় বৌদি'—
স্বর্গীয়া অনিলাদেবীর স্মরণে

এক

সারা রাত কঠোর ডিউটি শেষ করে শিলিগুড়ি ষ্টেশনের স্টলের চা নামধারী পানীয় আর সিঙ্গাড়া গলাধঃকরণ করে, সহকারী নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করছিলাম। অম্বলের ব্যারাম আমার কোনকালেই নেই। তাই নিতাইয়ের সিঙ্গাড়া খাওয়ার পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ শুনেও শুনতে পাচ্ছি না আমি। সারারাত ট্রেন ঠেঙ্গিয়ে রানিং রুমে যে যেয়ে পৌঁছতে পারলে অনেক স্বস্তি। পাহাড় থেকে প্রথম সমতলভূমিতে নেমে আসা শীর্ণকায়া, খরস্রোতা মহানন্দার পাশ দিয়ে দীর্ঘ পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।

কাব্যও আসে না তখন আর নিতাইয়ের ঘ্যান্ ঘ্যান্ শুনতেও ভাল লাগছে না। নেহাত ভদ্রতার মুখোশ দিয়ে মনোভাবটাকে ঠেকিয়ে রেখেছি। একপাশে ইঞ্জিনের পোড়া ছাই মেশানো কয়লার স্তূপ। তার মধ্যে ছোট বড় দলে ভাগ হয়ে বহু বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা কয়লা বেছে বা'র করছে। এই তাদের জীবিকা। এই কাজ করে ওরা ওদের মুখের রুটি সংগ্রহ করে।

আদিম কাল থেকে চলেছে এই খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা। আজও নিউইয়র্ক থেকে টোকিও অথবা কোপেনহেগেন থেকে কেপ অফ গুডহোপ, সর্ব্বত্র যে বিশাল গতিতে কর্মব্যস্ততা চলেছে তার অধিকাংশ কিন্তু নিয়োজিত হচ্ছে এই পেটের ভাত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। আমরা মিনি ম্যাক্সি, আর ওয়াটার গেট এর নিচে নামতে চাই না। এদের কথা জেনেও স্বচ্ছন্দে এদের অবহেলা করতে অভ্যস্ত।

কিন্তু কোন কোন সময় এমন আছে যখন এদের দিকেও দৃষ্টি

সরিয়ে আনতে হয়। আমি নিতাইকে সঙ্গে নিয়ে ঐরকম একটা দলের পাশ দিয়ে আসার সময় এক প্রৌঢ়াকে দেখলাম! সে আরেকটি যুবতীকে কি যেন বলছে মৃদুস্বরে। সেই যুবতী অবাক বিস্ময়ে মুখে মৃদু হাসি মাখিয়ে সকৌতুকে আমায় দেখছে।

থমকে দাঁড়ালাম। কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। মেয়েটি কালো। তার পরনের কাপড়খানা কয়লার গুঁড়োতে ততোধিক কালো হয়ে গেছে। কিন্তু শরীরে আছে নিটোল যৌবন। কাঁচা সতেজ তার অঙ্গের সৌষ্ঠব। কারো কারো কাছে লোভনীয়। আমার কাছেও হয়তো তাই কিন্তু আমার এই বয়সে ঐরকম লোভ শোভন নয়।

আমি থমকে দাঁড়াতে নিতাইয়ের গতিও রুদ্ধ হল। নিতাই কৌতূহলি হয়ে প্রশ্ন করে, 'কি হল দাদা দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?'

আমি অপ্রতিভ হ'বার লোক নই। বললাম, 'দেখ নিতাই জীবিকা অর্জনের আর এক প্রচেষ্টা।'

নিতাইও কম যায় না। আমাকে উদ্দেশ্য করে আবার প্রশ্ন করল, 'কি দেখছেন প্রচেষ্টা না প্রচেষ্টাকারিনী?'

আমি কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম না। চিন্তা করছিলাম আমাদের সম্পর্কে কি কথা থাকতে পারে ঐ যুবতী আর বৃদ্ধার। হতে পারে হয়তো ট্রেনে কখনও বিনা টিকিটে ধরেছিলাম। ওদের লক্ষ বস্তু আমরা নই আমি। বৃদ্ধা রমনীটি এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। হাসছে ঐ কাঁচা বয়সের মেয়েটাও। কয়লার মলিনতা কিন্তু ওর যৌবনকে একটুকু ম্লান করতে পারেনি। নদীতীরের জোরালো হাওয়াতে উড়ন্ত উচ্ছৃঙ্খল আঁচল, ওর যৌবনের সম্ভার, ওকে নায়িকাচিত রূপদান করেছে।

নিতাই বলল, 'কি গার্ড সাহেব ছুঁড়িটাকে দেখে মজে গেলেন মনে হচ্ছে। ওরে বাবা! ওরা আমার কথা নয় আপনার কথাই বলছে।'

আমার মাথার ভিতরে মস্তিষ্ক জাতিয় বস্তুটি একটু নড়াচড়া করে

উঠলো। ঐ প্রৌঢ়া রমনীটি তার যাই হারিয়ে থাকুকনা কেন, হারায়নি ওর চোখের মদিরতা। ও চোখ দুটো আমার বেশ ভালো করেই চেনা। খুব যেন চেনা ছিল এক কালে।

নিতাই একটা থলি হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। থলিতে রানিং রুমের জন্যে কিছু মাছ আর তরকারী নেওয়া হয়েছে ওটা খোয়া গেলে উপাদেয় আহার্য্যের ব্যবস্থা ওখানে নাও হতে পারে।

বৃদ্ধা এবার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। একবার ভাবলাম অপমানজনক কিছু করবে নাতো? এই শ্রেণীর মেয়েদের পক্ষে সেটা একেবারে অসম্ভব কিছু নয়।

কিন্তু না ওরা হাসছে, সে হাসি শত্রুতার হাসি নয়। সহৃদয়তার অঙ্গিকার।

বৃদ্ধার সঙ্গে ঐ কৃষ্ণবর্ণা সুন্দরী যুবতী ও আরও কয়েকটি অল্প-বয়স্ক ছেলে-মেয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধা এগিয়ে এসে আভূমি নত হয়ে আমাকে সেলাম করল। বৃদ্ধার পেছনে দাঁড়ানো মেয়েটি এবার আমার দিকে চেয়ে দেখছে আমি কি করি। মনে হল ওরা যেন বহুকাল আগের হারিয়ে যাওয়া অমূল্য রতন খুঁজে পেয়েছে।

আমার অবাক চাউনি দেখে বৃদ্ধা এবার হাসল। আকর্ণ বিস্তৃত সে হাঁসিতে আমি তার মুখের মধ্যেটাও দেখলাম। সেখানে অনেকগুলো দাঁত নেই। কিন্তু ঐ হাসি আমার পূর্ব্ব পরিচিত। ঐ হাসি স্বীয় মাধূর্য্যে মণ্ডিত।

তবুও আমি মনে করতে পারছিনা। বৃদ্ধা যেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো, 'কি গার্ডবাবু হামাকে এক দম ভুলিয়ে গেলি এতনা দিনের জান পহচান।'

কিন্তু পুরুষ মানুষের বয়স যতই হোক প্রৌঢ়া নারীর সঙ্গে বহু দিনের 'জান পহচান' ঝালিয়ে নিতে কারুর মন চায় না। নিতাইয়ের দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখলাম ওর মুখে সকৌতুক হাসি।

নিজের সম্মান রাখতে কণ্ঠে যত সম্ভব কঠিনতা এনে বললাম, 'কি বলছিস তোকে তো কখনও দেখেনি।' বয়স্কা ও যুবতী দুজনেই এক সঙ্গে হেসে উঠলো।

বয়স্কা একেবারে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ মেলে আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকাল, তারপর বলল, 'বাবু তু একেবারে বুদ্ধু বনিয়ে গেলি যে। নাকি হামাকে বুদ্ধু বানাইছিস্ ? হামার আঁখের দিকে ঠিকসে তাকিয়ে দেখ তো চিনতে পারিস কি না ?' বলেই আবার ওরা দুজনে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

আমি চুপচাপ বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকি। ওখান থেকে চলৎ-শক্তিও যেন রোহিত হয়ে গেল আমার। বেগতিক দেখে নিতাই বলে, 'গার্ড সাহেব আমি রানিং রুমে চলে যাই বরং। থলিতে মাছ আছে, ঠাকুরকে দিলে রান্না করবে।'

নিতাই আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই চলে গেল। এবার আমি একা আরও ফ্যাসাদে পড়লাম।

প্রৌঢ়া এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হামার নসিব খারাপ আছে বাবুজি। কেতনা দিন পরে মুলাকাত হল তো তুই হামাকে পহচানতে পারছিস্ না। তোরা মরদ জাত আছিস্ মর্জিহোনেসে সবই ভুলিয়া যাস্।'

কি অস্বস্তিকর পরিবেশ। আমি একটা মেলট্রেনের গার্ড, সভ্য সমাজের গর্বিত ব্যক্তি, রেল কর্মিদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়, তাকে মাঝরাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে এক কয়লা কুড়ুনী বয়স্কা নারীর একি প্রগলভ আচরণ।

যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোকে আমি চিনতে পারছি না, আর তোর সঙ্গে বাজে কথা বলার সময় নেই আমার।'

আমি চলে যাওয়ার উপক্রম করি কিন্তু ও ছাড়ে না। সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়ায়।

তারপর দুই হাত জোড়া করে বলে, 'বাবু তু একটুক দাঁড়া। হামার একটা কথা শুন্।'

ওকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে হল না, বললাম, 'ঠিক আছে বল কি বলবি তাড়াতাড়ি।'

আমি সত্যিই ওকে চিনতে পারছিনা। ওর মত সমাজের নিকৃষ্ট একটা রমণীর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ চেনা জানা কিভাবে থাকা সম্ভব একথাও বুঝতে পারছিলাম না। অথচ কেন যেন মনে হচ্ছিল ওর কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়।

ও এবার গলার স্বরটা খাটো করে বলল, 'বাবু তু হামার কথার একটা জবাব দিবি?'

বললাম, 'যা বলবি তাড়াতাড়ি বল, আমার সাথী চলে গেল। আমিও এবার যাব।'

প্রৌঢ়া, ওর নাম জানি না, এবার ঝঙ্কার দিয়ে, দুই হাত নেড়ে বলল, 'তোর সাথী গেল তো হামি কি কোরবে। তুর সাথীকে হামার কুন দরকার।' তারপর গলার স্বরে যথাসম্ভব মধুরতা এনে বলল, 'লছমীকে তোর ইয়াদ হয় না বাবু?' গলার স্বর নামিয়ে এনে এক রহস্যজনক আওয়াজে বলে, 'লছমীর জন্যে তুরা যত মরদ আছিলি সব দিওয়ানা হইয়েছিলি।'

আমার চোখের তারা বিস্ফারিত হল। মনে আসছে এবার ধীরে ধীরে। লছমী! হাঁ হাঁ, যে ছিল পাথর খাতের নায়িকা। ঈশ্বর যার শরীরে দিয়েছিল নিষ্পাপ স্বাস্থ্য আর অটুট যৌবন। মধুময়ী লছমীর লোভে হন্যে হয়ে ওকে শিকার করতে চেয়েছিল একদল হিংস্র মানুষপশু। কিন্তু এ কি সেই লছমী?

লছমী আমার মুখভাব দেখে উৎসাহিত হয়ে উঠল, বলল, 'কি বাবু মনে পড়েছে হামাকে।'

আমি নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে বললাম, 'তুই কোন্ লছমী?

লছমী একটু হাসল, সে হাসি বিষাদপূর্ণ, 'তুর মনে আসে না বাবু?

সে সময় তু'ভি জোওয়ান মরদ ছিলি বাবু। তু মালগাড়ীতে করে হামাদের লিয়ে আসলি পাথর বোঝাই করতে, ইয়াদ হয়?'

সন্দেহের নিরসন হল, 'এ সেই লছমীই।' কিন্তু জীবনে দাগ কেটে থাকলেও কালের দীর্ঘ প্রলেপে ওর স্মৃতি চাপা পড়েছিল।

ধীরে ধীরে লছমীর সবগুলো ঘটনা ছায়াছবির পটের মত পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। আমার অজান্তে আমার মুখাভাবের নিশ্চই কিছু পরিবর্তন ঘটে থাকবে। লছমী সেটা লক্ষ্য করে পরম উৎসাহে বলে উঠলো, 'কি বাবুজি তোর মনে পড়ল। সেইযে বড়া পাহাড়ের কিনারে তু গাড়ী লিয়ে আসতিস, হামরা মাথায় করে পাথর লিয়ে তোর গাড়ী বোঝাই করতাম।'

আমি ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে নিজের চিন্তারাজ্যের মধ্যে সাঁতরাতে থাকি। দূরে রানিং রুমের বারান্দায় তখন নিতাই বেশ জমিয়েছে মনে হল। দেখলাম কয়েকজন রেলকর্মী ওর সঙ্গে এই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ও তাদের হাত নেড়ে কি বোঝাচ্ছে।

কিন্তু আমি খুব একটা পাত্তা দিলাম না ওদের। কারণ লছমীর যৌবনের সে কাহিনী আমার যৌবনের একটা অধ্যায়। এতদিন নিজের বয়স যে বাড়ছে সেটা জানতাম কিন্তু কতটা বেড়েছে সেটার পরিমাপ করিনি। আজ কিন্তু বার্দ্ধক্যে জরায় আবৃত লছমী আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিল। মনের রঙ্গীন সৌধগুলো যেন কালরূপী কালাপাহাড়ের এক আক্রমণে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

সেদিনের সেই আমি ছিলাম যুবক, মৃত্যু রাজ্যের সীমানা ছিল অনেক দূরে। কালের চাকার আবরণে ঘুরতে ঘুরতে যে সেই সীমানার খুব কাছে এসে পড়েছি এই লছমী তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

আপাততঃ লছমীর পুনঃ আবির্ভাব অকস্মাৎ যেন আমার একটা বাঁধা সুরের তার ছিঁড়ে দিল। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস একেই বলে।

নিজে যা বুঝতে পারিনি এতদিন এক প্রৌঢ়া কুলী রমণী আমায় সেটা এক নিমেষেই উপলব্ধি করিয়ে দিল।

কাটিহারের সেই 'এভারগ্রীন' দেবেন দা হঠাৎ যেন বার্দ্ধক্যের শুকনো মর্ম্মর ধ্বনি শুনতে পেলাম।

লছমীর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা অস্বীকার করার কিছু ছিল না। অন্ততঃ এক বিষয়ে আমাদের উভয়ের মিল আছে। সেটা, আমরা একই সঙ্গে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে পড়েছি।

বললাম, 'হ্যাঁরে লছমী এই যবান লেড়কিটা কার?'

'হামার বেটি বাবু' লছমী সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দেয়: 'ঔর উষো তিনটা লেড়কা উইখানমে খাড়া আছে সব হামারি আছে, বিলকুল হামার।'

আমি আবার চুপচাপ দাঁড়িয়ে চিন্তা করবার উপক্রম করতেই সলাজ ভঙ্গিতে লছমী লজ্জাবনত চোখে বলল, 'হেই বাবু কি সোঁচতে লাগলি, আমাকে তো পুছলিনা হামার ইয়ে হাল কিমন করিয়ে হোল?'

আমি তখনও চিন্তা করছি। মানুষের ভিড়ে এই লছমীও কোথায় চাপা পড়ে আছে। কেউ ওর খবর রাখে না। লছমীও কারও কোন খবর রাখে না। খবর রাখার ক্ষমতা ওর নেই কিন্তু অদ্ভুত এই কয়েনসাইডেন্স। একই আবর্ত্তের দুই পাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে আমাদের দেখা হয়ে গেল।

লছমী আবার বলল, 'তুরা মরদলোক আজব আছিস। তোরা ভোমরা আছিস্। সব একই কিসিমের। হামার কথা তুই একদম ভুলিয়ে গেলি। কিন্তু বাবু বজরঙ্গ বালীর কসম হামি তুর কথা ভুলি নাই।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না! লছমী তোর কথা আমি ভুলিনি। আমার সবই মনে আছে। আমি তোর কথাই ভাবছি।'

উৎসুক হয়ে ও প্রশ্ন করে, 'কি ভাবছিস বাবু ?'

'ভাবছি তোর সব পুরুষ মানুষকেই একরকম মনে হল ? আমাকেও তোর রূপ যৌবনের স্তাবক বলে মনে করেছিলি ?' আমি শোধ দিতে চাইলাম।

ও এবার জিভ কেটে বলল, 'ছিঃছিঃ বাবু তোহার বাত আমি ভুলব না, তুই তো হামার দেবতা ছিলি। তুই হামার আন্ধেরীতে 'দিয়া' ছিলি'।

লছমী হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই বলতে থাকে, 'তোকে কেতনা ঢুঁঢ়লাম বাবু। কত গাড়ী আসলো কত্তো গেল। অনেক গার্ড সাহেব আসল নয়া কিন্তু তু আর আসলি না। কত জায়গায় কত বাবুকে পুছলাম কিন্তু তুর কোন হদিশ মিলল না।'

লছমীকে বাধা দিলাম না। আমি লছমীর বাকি ঘটনার সমস্তইটাই শুনলাম ওইখানে ঐ ভাবেই দাঁড়িয়ে। আমার পাশ দিয়ে ইউনিফরম পরে আমার বন্ধু সহকর্মি রানিং রুমের পথ দিয়ে যাওয়া আসা করল। কিন্তু তাদের কারুকেই লক্ষ্য করার মত ইচ্ছা আমার হল না। আমি চোখের সম্মুখে সেই লছমীকে দেখছিলাম।

লছমী, সেই যুবতী লছমী। সারা অঙ্গে তার যৌবনের অফুরন্ত সম্ভার অথচ চঞ্চলা হরিণীর মত লঘু এবং সতেজ সিংহীর মত শক্তিমতি। কৃষ্ণবর্ণ পদ্মের মত নিষ্পাপ ঢলঢলে মুখ।

লছমী তার কাহিনী শেষ করল কখনও হাসি, কখনও কান্না, কখনও বা আবেগের মাঝে।

একটু ইতস্তত: করে প্রশ্ন করলাম, 'লছমী তোর টাকা পয়সা কিছু দরকার হলে বল কিছু টাকা দেই।'

লছমী প্রবল আপত্তি করে বলল, 'বাবুজি তুই হামাকে ইয়াদ করেছিস আর কিছু মাংগ নাই হামার।'

লছমী, কয়লা কুড়ুনী লছমী আমার সামান্যতম দান গ্রহণ করতে অপারগ।

আমি ওর কাছে বিদায় নিয়ে রানিংরুমের দিকে যখন রওনা হলাম তখন ঘড়িতে বেলা দশটা বেজে গেছে।

মনে মনে চিন্তা করছিলাম, মেয়েদের এই আত্মসম্মান বোধ কি অর্থ, বিত্ত বা সমাজের উপর নির্ভর করে না? নইলে লছমীর মত সর্ব্বসুখ বঞ্চিত নারীর পক্ষে ঐ আত্মসম্মানবোধ কি বিলাস নয়?

দুই

রানিং রুমে এসে শিথিল শরীরে পা দিলাম। একটা ঘরে একটা আয়না বাঁধান সেকেলে ড্রেসিং টেবিল ছিল। বিরাট আয়না। প্রথমেই ঢুকলাম সেই ঘরটায়। বহুকাল পরে আজ বিশাল আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখতে গেলাম খুটিয়ে খুটিয়ে নিজের প্রতিফলিত অবয়ব। হাঁ এককালে দেখতে নেহাৎ মন্দ ছিলাম না। আজ বলি রেখাগুলো সেখানে জাঁকিয়ে অবস্থান করলেও একেবারে সেই সৌন্দর্য্য নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেনি। কিছু কিছু চুলে সাদা রঙ ধরেছে তবে কালো চুলের সংখ্যাধিক্য থাকায় তারা চাপা পড়ে আছে। ছাই চাপা আগুনের মত কোনদিন হয়তো আত্মপ্রকাশ করবেই।

এত দিন শুধু আপ ডাউন করে দিন কাটাচ্ছিলাম। গীতার কর্ম্মের ধর্ম্ম পালন করতে করতে যৌবন যে পার করে ফেলেছি আজ যেন সেটাই প্রথম উপলব্ধি করছি। যৌবনের সুহৃদ যারা ছিল সবাই একে একে আমায় ছেড়ে যেতে চাইছে মনে হল। লছমীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই এই চিন্তাটা আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলল।

এদিকে নিতাই আমার উপর মহাখাপ্পা। আমাকে দেখে বলল, 'কি আক্কেল আপনার, একটা কয়লাওয়ালি বুড়ির সঙ্গে দুঘণ্টা ধরে গল্প করলেন। তাও যদি ঐ ছুঁড়িটা হত তা হলেও বুঝতাম।'

পরমুহূর্ত্তে নিতাই ঠাকুরকে হাঁক দিল এবং তারই নির্দেশ মত ঠাকুর কয়েক পিস্ মাছ ভাজা, ফুলকপি ভাজা আর গরম চা এনে হাজির করল। নিতাই আমাকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে। এ যেন গুরুভক্তির চরম নিদর্শন।

জামা কাপড় না ছেড়েই চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। রানিংরুমে একটা বিরাট হট্টগোল চলছে তখন। আলিপুরের টি, টি, ই, বাবুর দল, দারজিলিং-এর গার্ড, টি, টি, ই, সকলেই ঠাকুরদের দিয়ে নিজের পছন্দ মত রান্না করিয়ে নিতে ব্যস্ত।

রানিং রুমের রান্না আমাদের কাছে পরম উপাদেয় বস্তু। বাড়ীতে যারা পছন্দমত রান্নার স্বাদ পায়না তারা এখানে নিজের ইচ্ছে মত রান্না করায়। প্রায় বেশীর ভাগ সহকর্মিই দেখি বাড়ীর রান্নার উপর প্রসন্ন নয়, খেতে হয় তাই খায়।

খগেন মজুমদার প্রায়ই একটা কথা বলে, 'বাঙ্গালীর মেয়েরা মশায় রাঁধতি জানেনা। মা ঠাকুমার কাচে যা শিখি আইচে সেই শুক্তোনি, চচ্চড়ী আর ঘণ্ট, এর বাইরে আর কিছু জানে না।'

মনে মনে আমিও এদের দলের, ঝাল তরকারীতে মিষ্টি দেওয়া আমার ভয়ানক অপছন্দ। চচ্চড়ী আর ডানলা, ডাল অথবা মাংস সর্ব্বত্র যেন চিনির গোলা অথচ কিছু বলবার উপায় নাই, বললেই অশান্তি। আমি তাই ওগুলোর নাম দিয়েছি 'মোরব্বা'।

চা পর্ব্ব শেষ হলে, জামা কাপড় ছেড়ে আমি বাথরুমে যেয়ে মনের আনন্দে স্নান সেরে নিলাম। আজ আর মহানন্দায় স্নান নয়! এ সময় নদীটায় খুব অল্প জলই থাকে। স্নান করে সুখ হয় না।

স্নান পর্ব্ব সারা হলে যখন নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে ফিরে এলাম তখন বুঝলাম আমাকে কেন্দ্র কারে এক বিরাট ষড়যন্ত্র দলা পাকিয়েছে। রেলবাবুরা চিরকালটা তিলকে তাল করতে অভ্যস্ত। কয়লাওয়ালী বৃদ্ধার সঙ্গে আমার দীর্ঘ বাক্যালাপ এদের মনে রসের যোগান দিয়েছে।

নিতাইয়ের দৌলতেই এটা হয়েছে। নিতাই এর এই এক দোষ। ও আমাকে ভালও বাসে যেমন তেমনি সব সময় যেন শাসন করে রাখতে চায়। আমার বৃদ্ধ বয়সে কয়লাওয়ালির সঙ্গে দীর্ঘ আলাপন ওর মতে ন্যাকামীর পর্য্যায়ে পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ঘরে গার্ড চেকারদের বেশ একটা সমাবেশ হল। সবাই স্নান সেরে ফেলেছে। খাওয়ার এখনও দেরী আছে। এই সময়টা আমাদের কাছে বেশ প্রীতিপ্রদ। এখানে আমরা খুব স্বাধীন। বাড়ী ঘরের চিন্তা নাই। আমরা যেন নানা বয়সের লোক নই। আমরা একই বয়সের, একই কলেজের এক গুচ্ছ ছাত্র। ক্লাশ পালিয়ে কফি হাউসে আড্ডা জমিয়েছি। কফি হাউসের ইণ্টেলেকচুয়াল স্ট্যাটাস যার যতই থাকুক না কেন আমাদের ঐ অসম বয়সের সমান টেম্পারেমেণ্টের ঐ আড্ডা যেন এক অনাড়ম্বর উৎসব।

কিন্তু আজকে ওরা ষড়যন্ত্রকারী। ওদের মুখ চোখ হিন্দিছবির গুণ্ডাদলের বসের মত রহস্যজনক।

'কি ব্যাপার দাদা, শুনলাম একজন মেয়ের সঙ্গে বেশ মজে গিয়েছিলেন।' পরম হিতৈষি রসিকপ্রবর গার্ড শ্রীকৃষ্ণ বোস এই ভাবে প্রথম আক্রমন সুরু করল। আমি ওদের মধ্যে খুঁজছিলাম নিতাইকে। হতভাগার উপর আমার এত রাগ হচ্ছিল, ওটাই যত নষ্টের মূল। কিন্তু উল্লুকটা পলাতক।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বন্ধু শরৎ বলল', তুমি তা ভালই করেছ ভাই। কয়লা থেকেইতোহীরের জন্ম। কয়লা খনিথেকে নাকি হীরে খুঁজে বার করেছ?' তবুও আমি চুপ চাপ। কোন উত্তর দেইনা।

আমার স্তব্ধতা ওদের উৎসাহ যোগায়। বন্ধু নরেশ বলল, হীরেটি বহুদিন খনিতে চাপা ছিল, একেবারে পাকা হীরে।

আমি এবার বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমাদের খেয়ে দেয়ে কোন কাজ নেই শুধু পরনিন্দা আর পরচর্চা?'

নরেশ বলল, 'তুমি টেম্পার দেখালে তো চলবেনা, খবরটা আমি বৌদির কাছে পাচার করবনা। রানিং রুমের খবর রানিং রুমের চৌহদ্দির বাইরে যাবেনা। রানিং রুম আমাদের লীলাক্ষেত্র একান্ত ভাবে আমাদেরই।'

আমার কৃত্রিম রাগটা আর দমন করা সম্ভব হোল না।

বললাম, 'থাক তোমরা যখন বৌদি পর্য্যন্ত যাবেনা বলছ তখন রাগটা ছেড়ে দিচ্ছি'

হঠাৎ বিনা কারণে শম্ভুগার্ড হো হো করে ফোগলা মুখ ব্যাদন করে হেঁসে উঠলো।

সকলে শম্ভুবাবুর বক্তব্যের জন্যে ওর হাঁসি থামা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল।

হাসি থামলে শম্ভুবাবু বললেন, 'কিন্তু বলিহারি যাই মশাই খুঁজে খুঁজে একটা কয়লা বাছা বুড়িকে টারগেট করলেন শেষে।'

আমাদের এই আসরে দার্জ্জিলিং এর এক বৃদ্ধ গার্ড ছিলেন। বহুদিন অবসর নিয়েছেন তবুও তার কাজ হল এই আসরে উপস্থিত থাকা। রানিং রুমে দৈনিক তার আসা চাই। হয়তো এখানে আসা বন্ধ হলে তার জীবন দীপও নিভে যাবে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কানে তিনি প্রায় একেবারেই শোনেন না। তবুও কি রস যে তিনি পান, তিনিই জানেন। আমাদের হাবভাব কথাবার্ত্তা দেখেই তিনি রসাস্বাদন করেন।

একটা কান চেপে ধরে আরেকটা কান এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কি ভায়া তোমাদের এত খুশী খুশী ভাব কেন? কোন মেম সাহেবের প্রণয় কাহিনী নাকি। তা বেশ ভায়া বেশ।'

কথাটা শুনেই কিন্তু আমার হাড় পিত্তি জ্বলে উঠলো, ভেংচে উঠলাম তাকে, 'মেম সাহেবের প্রেম কাহিনী, রসতো আপনার কম নয় তবু যদি সবটা শুনতে পেতেন।'

কি বুঝলেন তিনিই জানেন, কিন্তু খুব খুশী হয়ে বললেন তা, 'বেশ ভায়া, প্রেমের গল্পে কার না রুচী আছে। মানুষের মধ্যে যদি প্রেমই না থাকল তবে আর রইল কি: প্রেম তো আমরাও এক সময়ে করেছি। তা ছাড়া স্বয়ং ভগবান নিজেই তো প্রেমময়। তাঁর প্রেমলীলার অপূর্ব্ব কাহিনী জগতের কে না জানে বল?'

তার কথা শেষ হওয়া মাত্র একটা হাঁসির হর্‌রা উঠলো আর তিনি বোকার মত ক্যাল্ ক্যাল্ করে সকলের মুখের দিকে চাইতে লাগলেন।

এবার আমার মায়া হল লোকটার-উপর। আহা লোকটা সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম করে, অবসর নিয়েও রেলের মায়া ভুলতে পারেন নি।

আমি বললাম এবার, 'ভাই তোমরা যা শুনতে পাচ্ছ সেখানে আনন্দ রসের চেয়ে করুণ রসই বেশী ও শুনে তোমরা লাভবান হবে না।

নাটক বিশারদ যোগেন ব্যানার্জ্জী টেবিলে একটা চপেটাঘাত করে বলল, 'না হোক আমরা আজ করুণ রসের গল্পই শুনতে চাই। মোদ্দা কথা তুমি আর সেই কয়লা বাছা বুড়ি তাতে থাকবে এই আমরা চাই।'

* * *

তারিখটা ঠিক আমার মনে নেই তবে মোটামুটি সময়টা ১৯৪০ সাল। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভের রেশ আমাদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। আমরা সরকারের অনুগত কর্মচারী। আন্দোলনে প্রকাশ্য যোগাযোগ রাখা সম্ভব ছিল না। তবে মনে মনে আমরাও স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু আমাদের আন্দোলন ছাই চাপা আগুনের মত।

নূতন মালগাড়ীর গার্ড হয়ে কাটিহারে একটা রেলওয়ে কোয়ার্টার পেয়েছি। রেল গার্ডদের ডিউটি রোষ্টার তৈরী হত স্টেশন মাস্টারের দায়ীত্বে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা হত সহকারী স্টেশন মাস্টারের হাতে। এই আধা মালিকদের খুশী করতে পারলে সুবিধাজনক ট্রেনে বুকিং পাওয়া একটু সহজ হয়। এ রেওয়াজ চিরদিনের।

তখন মালগাড়ীতে কাজ করি। কাজেই মেল এক্সপ্রেস নিয়ে অত মাথা ঘামাই নি। কিন্তু মালগাড়ীর মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য

আছে। আপনারা জানেন ব্যালাস্ট ট্রেন বা স্টোন ট্রেনও মালগাড়ী।

বি, সি, দত্ত একজন নূতন গার্ড। ও বাধা দিয়ে বলল, 'দাদা এই স্টোন ট্রেন আর ব্যালাস্ট ট্রেন সম্বন্ধে একটু ডিটেলে—' ওকে বাধা দিয়ে যুবক চেকার বি, এন, সিনহা চেঁচিয়ে উঠলো, 'থাম ত তুমি, তোমার এই এক কাজ। চলছে একটা গল্প তার মধ্যে বাগড়া দেওয়া।'

ওদের সংঘর্ষ বাধবার আগেই ওদের নিরস্ত করলাম, 'তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না আমি নিজেই ডিটেলে যাব।'

আবার সুরু করি ; সাধারণতঃ ব্যালাস্ট ট্রেনে করে রেল লাইনের রক্ষণা-বেক্ষণ সংক্রান্ত সাজ সরঞ্জাম বহন করা হয়। যেমন ভাঙ্গা পাথর, কয়লা গুড়ো বা ছাই, মুরাম ইত্যাদি। আর স্টোন ট্রেন পাথরের বোল্ডার ইত্যাদি পাথর জাতীয় বহুবিধ জিনিস পাহাড়ের কোল থেকে বয়ে নিয়ে আসে।

বিরাট পাহাড়ের পাদদেশে বড় বড় কোয়ারী তৈরী হয়। ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় পাথরের টুকরা জমা করে, খোলা ট্রাকে বোঝাই করে ঠিকাদারের কুলি কামিনরা। সেই ট্রেন চালিয়ে আনে ড্রাইভার আর গার্ড, দীর্ঘ বিপদ সঙ্কুল জঙ্গলাবৃত রেল পথ দিয়ে।

চাকরী পাওয়ার আগে রেল সম্বন্ধে কত কি শুনেছি কিন্তু চাকরী পাওয়ার পরে মনে হল অথৈ সমুদ্র আর সে সমুদ্রে আছে বিভিন্ন আকৃতির সব রাঘব বোয়াল। বিচিত্র তাদের চরিত্র। সমুদ্রের যে দুর্গম স্থানে সাধারণ জলজন্তু যেতে ভয় পায় দূষিত জলের ভয়ে এরা সচ্ছন্দে সেখানে যাতায়াত করে। দূষিত জল পান করাই তাদের স্বভাব।

দূষিত জল তখন পর্যন্ত আমার পেটে পড়েনি। বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের সঙ্গে আমার পরিচয় হতে আরম্ভ হয়েছিল। দুচার জন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান বন্ধু বান্ধবও জুটেছিল।

এ সব বন্ধুত্বের একমাত্র কারণ হয়তো এই যে আমরা সকলেই একই শরের নিশানা। তোমরা এখন যারা মালগাড়ীতে ডিউটি কর তারা আমাদের সময়কার কঠোর ডিউটির কথা কল্পনাও করতে পারবেনা। আগের দিন সারা রাত ডিউটি করে বাড়ী আসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বুকিং এসে যেত। আইন অনুযায়ী রেষ্ট ক্লেম করতে গেলে ট্রানস্ফার অর্ডার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মুভ্ করতে বলে দিত।

আমাদের সময়ে সবচেয়ে ভীতি প্রদ ছিল কলম্যানের আবির্ভাব। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই, হাতে বুকিং এর খাতা নিয়ে মূর্ত্তিমান যখন তখন উদয় হত। শুকদেব আর মুকুন্দ ছিল আমাদের কলম্যানের নাম। যদিও ষ্টেশন মাস্টারের নির্দ্দেশে ওদের ডিউটির খাতিরেই আসতে হত তবুও ওরা আমাদের কাছে যমদূত নামেই পরিচিত ছিল। বিশ্বাস করো গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় যখন মাথার ধারের জানলায় দাঁড়িয়ে ও গার্ডবাবু বলে ডাক দিত তখন ঘুম ভেঙ্গে মাথার কাছে আবছায়া-মূর্তি দেখে ভয়ে পেটের পিলে চমকে উঠতো।

সারা রাত ঘুমুতে পারতাম না ভালকরে। ঘুমের মধ্যেই মাঝে মাঝে চমকে উঠতাম। গার্ডের চাকরী করে মন প্রাণ সবই উৎসর্গি-কৃত হয়েছিল এই ভাবে।

আমার নিজের একটা ঘটনা শোন। আমি একবার রেষ্ট ক্লেম করে বদলি হলাম কাটিহার থেকে শান্তাহার। বাড়ীতে স্ত্রী ভয়ানক ভাবে অসুস্থ সে কথা বলতে গেলে ডি, টি, এস, সাহেব উলটে বললেন, 'বদলি হয়ে যদি তিন ঘণ্টার মধ্যে যাত্রা না কর তা হলে বাড়ী চলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হও।' তাছাড়া টুকি টাকি প্রোমশন ও ইনক্রীমেণ্ট বন্ধ করে কত নিরীহ গো বেচারির ভবিষ্যতের মূলে-কুঠারাঘাত করা হয়েছে।

যাই হোক সে সব থাক এখন কথা যা বলছি তাই শোন এবার।

॥ তিন ॥

সে দিন বহু কপালগুণে রাত্রিটা ছুটি পেয়েছিলাম। ঘুমিয়েছিলাম খুব কিন্তু ঠিক গভীর নিদ্রা নয়, মাঝে মাঝে চমকে উঠছিলাম। মনে হচ্ছিল শিয়রে সেই যমদূত সদৃশ কলম্যান দাড়িয়ে আছে।

ভোর বেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় কিন্তু সত্যিই ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম। খুব সুন্দর স্বপ্ন। কিন্তু কার ডাকাডাকি হাঁকা হাঁকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। এই ভোর বেলার দুর্লভ সুখকর নিদ্রাভঙ্গ হলে কার'না রাগ হয়। নির্ঘাৎ বেটা·কলম্যান। কিন্তু চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে দেখি না তেমন কিছু নয়, আমারই বন্ধু প্রসাদ। ওকে ভেতরে এনে চেয়ারে বসালাম। ব্রাশে খনিকটা পেষ্ট মাখিয়ে মুখটায় ব্রাশ চালাতে চালাতে ওর খবর নিলাম।

'কি প্রসাদ এই সকাল বেলা কি ব্যাপার ?'

প্রসাদ একটা রহস্যময় হাসি হেসে বলল 'ব্যস জব্বর খবর আছে। সেরকম খবর না থাকলে কি আর সাত সকালে এসে তোমার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাই।'

উদ্বেগ যত সম্ভব দমন করে বললাম, 'খববটা শুভ নিশ্চই'।

ও উত্তর দিল চেয়ারের হাতল চাপড়ে,'আরে মারিতো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার' এবার ভাণ্ডার লুঠ করার বন্দোবস্ত করে এনেছি।'

আমি ধৈর্য্য ধারণ করে ওকে বসতে বলে মুখ হাত ধুয়ে ঘরে এলাম। তার পর বিছানাটার একপাশে বসে ওকে প্রশ্ন করলাম, 'আজে বাজে কথা রেখে আসল ব্যাপারটা খুলে বলত ?'

প্রসাদ একটা বাদশাহী কায়দায় কুর্নিশ করে চেয়ারে বসে পরল আবার, 'জিহুজুর আভি পেশ করতাহুঁ।'

প্রসাদের বাড়ী বিহারের এক অখ্যাত গ্রামে। কিন্তু হলে কি হবে লেখা পড়া শিখেছে এবং চাকরী করতে এসে ও খুব দ্রুত বাংলা ভাষাটা শিখে ফেলেছে। বাংলা ভাষা আর বাঙ্গালী বন্ধু ওর খুব প্রিয়। বস্তুতঃ একজন অবাঙ্গালীর বাংলা ভাষায় এত প্রচণ্ড দখল আমি এর আগে বা পরে আর কখনও দেখিনি।

প্রসাদ আবার আমাকে তাতাবার জন্যে বলে, 'খবরটা শুনেই তুমি একবারে চাঙ্গা হয়ে উঠবে।'

আসল কথাটা প্রসাদ ভাঙ্গতে চায়না দেখে এবার আমার ধৈর্য্য—চ্যুতি ঘটে। আমি বললাম, 'তোমার গৌরচন্দ্রিকা রেখে আসল কথা যদি বলতে হয় তো বল না হলে বাদ দাও, আমার প্রয়োজন নেই চাঙ্গা হওয়ার।'

'আহা চটো কেন?' প্রসাদ আমাকে শুখবরটা দেয় এবার:; 'কাল পরশু একটা ষ্টোন ট্রেন স্টার্ট করছে গিতালদহ থেকে। দু'জন গার্ড থাকবে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তোমার আর আমার নামে দুটো অর্ডার করিয়ে এনেছি। একেবারে হাতে হাতে অর্ডার নিয়েছি। কালকেই রাত্রে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আমাদের স্পেয়ার যেতে হবে।'

'সর্ব্বনাশ!' আৎকে উঠি আমি, 'তুমি যে অসাধ্য সাধন করে ফেলেচ, ও ট্রেনের বুকিং তো নিলামে ওঠানো হয়।'

প্রসাদ আত্ম প্রসাদের হাসি হেসে বলে, 'আমাকে তো তুমি পাত্তাই দিতে চাওনা। নিলামের সবচেয়ে বেশী ডাক দিতে আমি পেছপাও নাকি?'

আমার মন সায় দেয়না, 'না প্রসাদ ওই ভাবে বুকিং নিতে আমি রাজী নই, একটা আনফেয়ার পথে—'

বাধা দিয়ে প্রসাদ বলে, 'ওটাই আমাদের পক্ষে এক মাত্র 'ফেয়ার' পথ। ও সব বাজে প্রেজুডিস বাদ দাও। ওই জন্যে তোমার জীবনে কিছু হবে না।'

আমি অন্য কথা বলি, 'তোমার কথা জানিনা তবে টাকা পয়সা খরচ করার সামর্থ আমার নেই। তুমি তো জান আমি গরীব লোক। তা ছাড়া ও সব ব্যাপারে আমি অভ্যস্ত নই।'

প্রসাদ একটু রাগ করে, 'তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি।' তারপর শান্ত গলায় বলে, 'যদি কিছু মনে না কর, টাকাটা তোমার এখন দিতে হবে না। আমি ম্যানেজ করে নিয়েছি। আমাকে পরে দিলেই হবে।'

তবুও আমার দ্বিধা ভাব থাকে। বলি, তোমার অবস্থাও তো সেরকম নয়, আর স্টোন ট্রেনে ডিউটি করেও আমি অসৎ ভাবে পয়সা চাইতে পারব না।'

ও আমার কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না, বলল, 'ওসব দায়িত্ব আমার। তুমি হচ্ছ আমার দোস্ত, তোমার সঙ্গে ষ্টোন ট্রেন নিয়ে গেলে আমাদের বোরিং ভাবটা থাকবে না। এখন ওসব চিন্তা ছেড়ে তৈরী হয়ে নাও। কাল রাত্রিবেলাই আমরা রওয়ানা হচ্ছি।'

প্রসাদ নিজের মনেই বলে চলল, 'আরে তোমার গরিবী এবার হটাবো। ষ্টোন ট্রেনে ডিউটি করে এক মাসের মধ্যেই তোমার অভাব দূর করে দেব।'

অগত্যা আমি রাজী হলাম। এবার ওকে একটু চাঙ্গা করার জন্যে প্রশ্ন করলাম' 'কি ভাবে ম্যানেজ করলে সেটা একটু শুনি বল।'

ইতি মধ্যে চাকর গজা এসে দুকাপ চা দিয়ে গেল। সকাল বেলায় চা আর গরম কচুরী সহযোগে তুষ্ট হয়ে প্রসাদ বলতে সুরু করে, 'এক্স, ই, এন অফিসের নুতন বড়বাবু আমার দূর সম্পর্কের সম্বন্ধী, এ খবর গার্ড মহলে কেউ জানেনা। কাল রাত্রে তাঁর বাড়ী গিয়ে একে বারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফিরে এসেছি। উনি একেবারে অর্ডার করিয়ে এনে রেখেছিলেন।'

আমি বোকার মত প্রশ্ন করি, 'আর টাকা?'

প্রসাদ প্রশান্ত মনে বলে, 'আমাদের সম্বন্ধটা তো বুঝতেই পারছ একটা সুমধুর সম্পর্ক, কাজেই ওসব ব্যাপার পরেই হবে।'

আমি কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারিনা, বললাম, 'প্রসাদ, ষ্টোন ট্রেন এ যাত্রা মানে হল দীর্ঘ সফর। রেল কোম্পানীর ঘড়ি দেওয়ার কথা। এখন পর্য্যন্ত সাপ্লাই দেয়নি। নিজের তো একটা নূতন কেনার মত ক্ষমতাও হয়নি। কি ভাবে কি করব। তা ছাড়া জানই তো ষ্টোর বাবুকে আজ পর্য্যন্ত আপাদ মস্তক কত তেল মালিশ করেছি। কিন্তু সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে।'

প্রসাদ মহা বিজ্ঞের মত বলল, 'তুমি আচ্ছা আনাড়ি। এতদিন চাকরী করেও কিছুই জাননা। সংসারে শিশু থাকলে বেবিফুডের অভাব হয়না। যিনি খান চিনি, তাকে যোগান চিন্তামনি।

অনুচ্চৈঃস্বরে বলল, 'ঠিকাদারের কাছ থেকে তোমার ঘড়িও ম্যানেজ হবে।'

আমি বললাম, 'কিন্তু টাকা তো সে চাইবে, তাকে তো ঘড়িটা কিনতে হবে।'

প্রসাদ এবার হতাশ ভাবে বলল, 'ওঃ সত্যি তোমার মাথায় গোবর ভরা আছে। বাঙ্গালীদের ব্রেন খুব শার্প বলেই জানতাম কিন্তু তোমায় দেখে আমার মত পালটাতে হচ্ছে।'

আমি বোকার মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলাম ওর দিকে, বললাম, 'সত্যিই ভাই আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।'

প্রসাদ বলল, 'শোন ঘড়িটা তোমার কাছে মূল্যবান হতে পারে কিন্তু ঠিকাদারের কাছে তোমার মূল্য তার চেয়েও অনেক বেশী। সুতরাং তোমাকে একটা ঘড়ি মুফ্‌তে দিয়ে ঠিকাদার তোমার মন জয় করতে চাইবে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'বল কি প্রসাদ?'

প্রসাদ সদম্ভে বলে, 'তবে আর কি বলছি'

তারপর রহস্য করে বলল, 'কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে.

তুমি দেখেও দেখলে, ঠেকেও ঠেকলে

তবুও তো তুমি শিখলে না।'

প্রসাদের কথায় আমরা দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম।

বাইরে আবার কড়া নাড়ার খট্ খট্ শব্দ হল। আমরা দুজনেই এগিয়ে গেলাম। দরজা খুলে যে লোকটাকে দেখলাম তাকে চিনি কিন্তু খুব পরিচিত নয় আমার। ওকে দেখেই কিন্তু প্রসাদ খুশীতে উপচে উঠল, 'আরে কেশরীমল সাহাব আইয়ে, অন্দর আইয়ে।'

এক গাল হেসে প্রসাদের কেশরীমল সাহাব ভিতরে ঢুকে বললেন, 'হাম যো সোঁচাথা ওহি হুয়া। দোনো গার্ড সাহেব কো একহি জাগা পর মিল গয়া।

লোকটা জাতে সিন্ধিয়া। মুখ চোখ দেখেই মনে হয় এ লোক মহা ধুরন্ধর। একটা কেমন শেয়াল-পণ্ডিত মার্কা মুখের ভাব। লোকটার অসাধারণ পয়সা। সেই পয়সার গুনে রেলের বহু সাধারণ কর্ম্মী থেকে নিয়ে বড় বড় অফিসার পর্য্যন্ত, সকলেই ওর কথায় উঠা বসা করে।

লোকটা কথাবার্ত্তায় দেখলাম অতি বিনয়ী। প্রসাদের সঙ্গেই ওর কথা বার্ত্তা চলছিল। আমি চায়ের বন্দোবস্ত করতে যেতেই কেশরীমলজী বাধা দেন, 'আরে গার্ড সাহেব রহনে দিজিয়ে, কোই বখ্‌ত ফির আকে চা পি যাউঙ্গা। তকলিফ মৎ কিজিয়ে'।

সেই দিনই বিকেলে প্রসাদের আবার অবির্ভাব হল। হাসি মুখে প্রসাদ বলল, 'কি বলেছিলাম না, এই দেখ তোমার ঘড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

প্রসাদ পকেট থেকে একটা চক্‌চকে পকেট ওয়াচ বা'র করল।

হাতে নিয়ে দেখলাম বেশ দামী ঘড়ি। লোভনীয় ঘড়ি, নিতে কিন্তু মন সায় দিচ্ছিলনা। বেশ বুঝতে পারলাম আমাকে কিনে নেওয়ার প্রচেষ্টায়, প্রথম পদক্ষেপে সফল হল সিন্ধিয়া ঠিকাদার কেশরীমল।

ঘড়ির পালিশের চেক্‌নাই.আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ঘড়িটা আমি হাতে নিয়েছি। ঘড়িটা লোভনীয়, ওটা আমার প্রয়োজনও। কিন্তু মনে মনে ঠিক করলাম বিনা-মূল্যে ঘড়িটা আমি নেব না। অবশ্য ধারে পেতে আমার আপত্তি নেই।

প্রসাদকে বললাম, 'হাতে পয়সা এলেই কিন্তু ভাই এর দামটা আমি দিয়ে দেব।'

প্রসাদ আমাকে একেবারে আমল দিলনা। বলল, 'সে তখন দেখা যাবে। কেশরীমল কি করে ঘড়ির দাম উশুল করবে তুমি তা টেরটিও পাবেনা। মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করছে আর তার খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ, যেটা অবশ্য আমাদের কাছে একটা বিরাট অঙ্ক, ও দুর্নিতীপরায়ণ অফিসার দের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছে। আমাদের আর কি দেবে? ওর দানের বিশাল অংশটা আমাদের উপরিওয়ালাদের জন্যে। তুমি আমি তো ওর উচ্ছিষ্ট ভোগী মাত্র। তুমি না নিলে, ঠগবে। যদি না'ও তা হলেও জগতে কারুর কিছু আসবে যাবে না। একমাথা কালো চুলে যদি একটা সাদা চুলও থাকে তাতে কিচ্ছু ক্ষতি হয়না।'

আমি প্রসাদকে এতক্ষন বাধা দেইনি এবার ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'কিন্তু প্রসাদ আমি এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনা যে সকলের এই পথে চলাটাই মঙ্গল। আমি কিছুতেই এতে সায় দিতে পারছি না।'

প্রসাদ আবার একটা লেকচার দিল তার উত্তরে, 'তুমি মেনে নিতে পার বা না পার তাতে দুনিয়ার কিছু আসে যায় না। সত্যিই রেলের চাকরী করতে এসে তোমার মুখে শাস্ত্রের কথা শুনে আমার হাসিও পাচ্ছে, রাগও হচ্ছে। তুমি আমি তো কোন ছাড়, স্বয়ং ভগবানও সামান্য চাল কলা আর বাতাসা খাওয়ার আশায় বিশাল ত্রিভুবনের দায়ীত্ব কাঁধে নিয়ে বসে আছে। মানুষের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা দেবতারাও এক সময় রত্ন লাভের আশায় সাগর মন্থন করে, কৌশলে

অমৃত ভাণ্ড হাতাবার কম চেষ্টা করেন নি। এওতো আমাদের শাস্ত্রের বচন। আর নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে তারা অসুর কূলকে বঞ্চিত করার জন্যে কম ছলা কলা আর অসত্যের আশ্রয় নেননি।'

প্রসাদ একটু দম নিয়ে বলল, 'ভাই 'বুদ্ধির্যস্য, বলম তস্য' আর এই বুদ্ধির সাহায্য নিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে না নেওয়ার মত আহাম্মকি করতে আমি রাজী নই।'

প্রসাদের এহেন যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করতেই হল। অন্তত: ডিউটি রিফিউজ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। রাজী হলাম। যেয়েই দেখিনা কেন একটা শিক্ষা তো হবে। অভিজ্ঞতাটা অতএব বাড়বে বই কমবে না।

॥ চার ॥

বহু দূরের সফর, দীর্ঘ সময়ের বিদায়। আমাদের মত রেলের সামান্য চাকুরীয়ার যে স্ত্রী পুত্র পরিবার থাকা সম্ভব সেকথা সে যুগে রেলের কর্তারা মানতেন না। আমরা ছিলাম রেলকোম্পানীর কাছে অনেকটা মধ্যযুগীয় ক্রীতদাস সদৃশ। আমরা বয়সে তরুন সুতরাং রেলের দুই কামরার অস্বাস্থ্যকর খোপের মধ্যে যে আমার তরুণী স্ত্রী আছেন সে খবরে রেল কোম্পানীর প্রয়োজন ছিলনা। তার অসহায় অবস্থায়, রেল কর্মির ডিউটি জনিত অনুপস্থিতিতে রক্ষনা বেক্ষনের দায়ীত্ব রেল-কোম্পানীর থাকতনা কিন্তু কর্মির স্ত্রীর অর্থ নৈতিক অবস্থা বা সম্পত্তির খবর সংগ্রহ করার দায়ীত্ব ছিল। স্ত্রীর সম্পত্তি কেন আছে তার সঠিক খবর রেল দফতরে দাখিল করতে বাধ্য ছিল কোম্পানীর-ক্রীতদাসরা। অন্যথায় তার চাকরী খতম হতে পারত।

কোম্পানী বহুদিন অবলুপ্ত হয়েছে, কোম্পানীর স্থলে রেল দফতরের সৃষ্টি হয়েছে। তার সর্ব্বময় কর্ত্তা জনগনতান্ত্রিক সরকারের প্রতিনিধিরা। কিন্তু আইনের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। কর্তৃত্বই বদল হয়েছে শুধু।

যাই হোক অতশত বোধ তখনও হয়নি। স্ত্রীর কান্নাকাটিকে উপেক্ষা করে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে ম্যানেজ করে তাকে পিতৃগৃহে লোক দিয়ে পাঠাতে বেগ পেতে হলনা।

অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায়, ভাল মাইলেজ পাব এই ভরসা দিয়ে তাকে পিতৃ গৃহে পাঠালাম বটে যদিও মনে মনে জানতাম অর্থের চাইতে আমার সান্নিধ্যই তার অধিক কাম্য। কিন্তু আমার সোনালী ভবিষ্যতের সম্বন্ধে পরিপূর্ণ এক বক্তৃতা শোনবার পর আর তার বিশেষ আপত্তি হোলনা।

গার্ড-বাক্স গুছিয়ে, জিনিষ-পত্র নিয়ে, আমি আর প্রসাদ রাও নয়টায় নির্দ্দিষ্ট ট্রেনের একটা ইন্টার ক্লাশ কামরায় চেপে বসলাম। সঙ্গে সেই ঠিকাদার কেশোরীমল। সাধারণতঃ লোকটা যে ক্লাশেই ভ্রমন করুক আপাততঃ ইন্টার ক্লাশের যাত্রী।

ইন্টার ক্লাশ কথাটা এখন ইতিহাস। রেল কোম্পানী রেল সরকারে পরিনত হওয়ার পর এই ইন্টার ক্লাশটাকে তুলে দেওয়ার জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। সাধারণতঃ ইন্টার ক্লাশের যাত্রী হতেন তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত লোকেরা। মহিলা, শিশু, অসুস্থ্য বৃদ্ধদের নিয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে, অধিক অর্থব্যয় করতে অপারগ যাত্রীরা তৃতীয় শ্রেণীর অত্যধিক ভীড়টা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে ইন্টার ক্লাশে ভ্রমণ করতেন।

দফতর বরাবরই যাত্রীদের সুবিধা করার চেয়ে রেলগাড়ীর কায়দা করার দিকে বেশী তৎপর। তাদের ধারণা, যাত্রীদের জন্যে রেল নয়, রেলের জন্যে যাত্রীরা সুতরাং কিছু বাড়তি পয়সা দিয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী সুবিধা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। যাত্রীদের মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন কি? অথচ প্রথম শ্রেণী ও এয়ার কণ্ডিশনড্ কামরার মত ব্যয় বহুল ব্যবস্থার কোন রদবদল করা হল না। এর উদ্দেশ্য একমাত্র রেলদফতরের কয়েক জন মুষ্টিমেয় লোকই বলতে পারেন।

যাই হোক আমরা যে কামরায় ছিলাম সেটা একটা বিশাল কামরা। সাধারণ যাত্রী খুবই কম। বেশীর ভাগই ছিল রেলের রিলিভিং স্টাফ। গাড়ী ছাড়তেই কামরাটি রেলকর্মিদের জমাটি আসরে পরিনত হল।

মালগাড়ীর গার্ড, রাত্রি জাগা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। সুতরাং আমরা খুব সহজেই ভীড়ে গেলাম ঐ দলে।

অন্য কয়েকজন যাত্রী এতক্ষণ ট্রেনে ফাঁকা জায়গা পেয়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার মতলব ভাঁজছিল। কিন্তু আমাদের হট্টোগোলে তাদের

ঘুমের আশা নেই, দেখে কোনের দিকের বেঞ্চিতে জড়সড় হয়ে বসে রইল।

রেলকর্মিদের ক্ষমতা তখনকার দিনে ছিল বেশ ভাল-রকমই। এক এক জন, যেন এক একটি ক্ষুদে ম্যাজিষ্ট্রেট। কার সাধ্য তাদের উপর কথা বলে। বেশী কথা বললে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে নামিয়ে দিতে পারে।

কর্মীদের অধিকাংশ অন্ততঃ পয়সা দিয়ে টিকিট কেনেনি একথা বলতে পারি। কয়েক জন ছিল একেবারেই বিনা টিকিট। কোম্পানীর দয়ায় তাদের কাছে ভাড়া চাইবার শক্তি চেকার বাবুদের নেই।

অবশ্য এর উল্টো ফল ফলেছে। দেখতেই পাওয়া যায় প্রায়ই রেল কর্মিদের উপর ধোলাই পর্ব সমাধা করে আজকালকার যাত্রীরা। বাবা জল ঘোলা করেছিল বলে ছেলের ঘাড় মটকানোর এমন চমক-প্রদ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যায় না।

এখন যাত্রীদের কোন সুখ নাই। কর্মিদেরও নাই কোন নিরাপত্তা।

সরকারের কৃতকর্মের ফলে বিক্ষুব্ধ মারমুখী যাত্রিদের সম্মুখে নিরিহ রেলকর্মীদের ভিড়িয়ে দিয়ে রেল সরকার এক্সপিরিমেণ্ট করে। সম্ভবতঃ এই দৃষ্টান্তও বিশ্বের অন্যত্র বিরল।

গাড়ীর গতি যতই বাড়ে আমাদের উৎসাহ ততই উর্দ্ধমুখী হয়ে উঠে।

রেলের বাবুদের মধ্যে বয়স কোন ব্যবধান নয়। অবশ্য সেদিন সেই কামরায় আমরা অধিকাংশই তরুণ বয়স্ক ছিলাম। ভাগ্যক্রমে সেই রেল যাত্রায় আমরা বিভিন্ন জায়গার লোক বহুদিন পরে একত্র হয়েছিলাম। কিছুক্ষণের স্বাধীন জীবন যাত্রাও পেয়েছিলাম সেই সঙ্গে।

ষ্টেশন মাস্টার অমূল্য চ্যাটার্জি বলে, 'বহুৎদিন পরে আমরা

একত্রিত হয়েছি। আজ গানের আসর বসিয়ে দাও। কে কে গান গাইতে জান বলে ফেল।'

রবিদা ভরসাম্য হারিয়ে একটা কীর্ত্তনের সুরে, স্বরচিত দু'লাইন গেয়েই ফেলল 'এমন রাত যেন যায়না বৃথাই।

ফুল মালা গেঁথে আজি তোমারে সাজাই।'

অমূল্যবাবু বলল, 'যদি কেউ নাচ জান তা হলে তা ও বলতে পার আজকে সকলেই ফ্রি, কার কি ক্যাপিবার আছে দেখা যাক।'

অমূল্য চাটার্জির কথায় সকলের উৎসাহ যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

রাত যত বাড়ে, সঙ্গে তাল রেখে রেলগাড়ীর গতিও যেন বেড়ে যায়। আর ততই বাড়ে আমাদের আনন্দ উৎসবের উচ্ছ্বাস।

সকলে এবার আমাকে ধরল প্রথম গানটা আরম্ভ করবার জন্যে। অগত্যা একটা একেবারে দেহাতি হিন্দি গানের কলি দিয়ে সুরু করি আমি —

'তাম্বাকু নাহি হায়
কেইসে কাটেগা সা-রি রাত,
তাম্বাকু এই স্যা মোহ্নী
জিসকি বড়ি বড়ি পাত ;
লাখ টাকাকে আদমী
এই স্যা খাড়া পসারে হাত।'

গান শেষ করেই আমি হাতের চেটোয় খৈনী পাকাবার ভঙ্গিমা করে দেখালাম। দেখতে হল না, এতেই আসর জমে উঠলো। আমার পোজ্ সমস্ত কামরায় হাসির একটা ফোয়ারা ছড়িয়ে দিল।

যে সমস্ত অন্য যাত্রী প্রথমে আমাদের উপর বিরক্ত হয়ে কোনের দিকে বসেছিল তারাও যেন খানিকটা উৎসাহিত হয়ে আমাদের কীর্তি কলাপ দেখতে লাগল। একজন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরাতে আরম্ভ করল।

আমার গান শেষ হওয়ার পর প্রসাদ এগিয়ে এল, 'তুমি যখন

বাঙ্গালী হয়ে হিন্দি গান গাইলে তখন দেখ আমি বেহারী লোক বাংলা গান গাইতে পারি কিনা।'

উপস্থিত সকলেই হাততালি দিয়ে প্রসাদকে অভিনন্দন জানাল।

প্রসাদ সুরেলা কণ্ঠে গাইতে আরম্ভ করল।

'এমন চাদিনী রাতি বিফলে না যায় গো বিফলে না যায়।'

প্রথম লাইন গাইবার পর প্রসাদ কোমরে হাত দিয়ে নাচের ভঙ্গি করে নাচতে আরম্ভ করল। কোমরটা তার বিভিন্ন ভঙ্গিমায় উঠা নামা সুরু করলো।

সকলে হৈ হৈ করে উঠল। অন্য প্যাসেঞ্জারগুলো প্রায় সকলেই এবার উঠে হাসি হাসি মুখ করে বসল। শুধু একজন বেরসিক পেঁচাপানা মুখ করে, জানালার বাইরে গভীর অন্ধকারের দিকে ফিরে রইল। লোকটা শুধু একজন বেরসিক নয় একজন মহাবেরসিক লোক বলে মনে হ'ল।

দিনাজপুরের রিলিভিং এ, এস, এম ছিল ঐ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত তোতলা। দেখলাম সে ভদ্রলোকেও হাত তালি দিয়ে প্রসাদের গানে তাল দিচ্ছে, গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইছে।

'এমমমন চাচাচাচা।'

গানে শুনবো কি সকলে ওকে দেখেই হাসতে আরম্ভ করে। ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে গান গাইছিল হঠাৎ হাসির রোল কানে যেতেই তার হুঁশ হল। আমাদের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

ব্যাপারটা রসিকতা থেকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে ভেবে যখন আমরা উদ্বিগ্ন ঠিক তখনই গাড়ীটা একটা ষ্টেশনে থেমে গেল আর একটু পরেই ট্রেনের চেকার দুজন বিনা টিকিটের যাত্রীকে এনে হাজির করল আমাদের কামরায়।

বলল, 'এই নাও টিকিটের ভাড়া আদায় করতে পারলাম না, নাচ, গান দেখে উশুল করে নাও।

ওদের দেখে আরেকটা হাসির হর্‌রা। যাত্রী দুজনের একটু বিশেষত্ব ছিল। মহাভারতের ভাষায় বলা যেতে পারে 'শিখণ্ডি'।

ঐ দু'জন, সুমিষ্ট ঢোলক আর হাততালি সহযোগে নাকের নোলক নাচিয়ে নাচিয়ে আর শাড়ীর আঁচল উড়িয়ে দিয়ে নারী সুলভ ভঙ্গীতে ঘুড়ে ঘুড়ে নাচিতে লাগলো আর সেই অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গীমা আরও মধুময় হয়ে উঠলো যখন তারা স্বজাতীয় 'হেঁড়ে গলায়' অপরূপ সঙ্গীতের সুর লহরি সংযোগে আত্মপ্রকাশ করলো।

কিছুক্ষণ পরে হৈ হুল্লোর কিন্তু শেষ হল কারণ আমাদের সঙ্গী যাত্রিদের অনেকেই মাঝ পথে নেমে গেল। যে অল্প কয়জন ছিলাম, তারা নিরাশ হয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছি।

প্রসাদের ডাকাডাকিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।

প্রসাদ চেঁচাচ্ছে, 'আরে শিগ্‌গির নামো গিতালদহে গাড়ি বহুক্ষণ দাড়িয়ে আছে।'

ব্যস্ত হয়ে চোখ কচলে দেখি সত্যিই তাই। তাড়াতাড়ি দুজনে মালপত্র নামিয়ে নিলাম।

আমরা স্টেশন প্লাটফরমে নাম'বার কিছুক্ষণ পরেই গাড়িটা ছেড়ে চলে গেল। আপাততঃ এই গিতালদহ আমাদের গন্তব্যস্থল। এই গিতালদহ থেকেই আমাদের শেষ পর্য্যায়ের ভ্রমণ সুরু হবে।

এর আগে গিতালদহ জংসনে আর কখনও আসার সুযোগ পাইনি। আমারও না, প্রসাদেরও তাই। গিতালদহের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

ট্রেনে যেতে যেতে বহু রাত্রি প্রভাত হয়েছে। মাঠের মাঝখান দিয়ে বা নদীর পোলের উপর দিয়ে আমার ট্রেন কতবার ছুটে চলেছে কিন্তু এত সুন্দরতার সন্ধান পাইনি। ডিউটির সময় নিজেকে যন্ত্রের মত চালিত করেছি। কাব্য করার সুযোগ হয়নি। কিন্তু সেদিনের সেই সকালটা খুবই মিষ্টি মনে হচ্ছিল।

এদিকে রেলের এক পরিচিত দৃশ্য দেখে আমার খুব হাঁসি

পাচ্ছিল। এক নিঃস্ব প্রায় লোককে পাকড়াও করেছে ষ্টেশন মাস্টার। সব রকম ভাবে চেষ্টা করেও কোন মাশুল আদায় করতে পারলেন না। যতবারই বলেন, ততবারই ও করুণ কণ্ঠে বলে, 'হুজুর মাই বাপ, বহুত গরীব, আপকো গোর লাগইছে বাবুজি। পাশমে এগো ঢেবুয়া নাইখে সরকার।'

বড়বাবু ভেংচে ওঠেন, 'গোর 'লাগাইছে বা'র কর্‌ছি আর ঢেবুয়া আছে কিনা সেটাও দেখে নিচ্ছি। আজ তোকে জ্যান্ত গোড় দেব আমি।'

বলেই হাঁক পাড়েন, 'রামলগন, এই রামলগন?' রামলগন অনতি বিলম্বেই হাজির হয়, 'কিয়া বাত হায় বড়াবাবু?'

'এই ছাখ এব্যাটা গরীব আদমী, এর তল্লাসী নে।' লোকটি একটু চঞ্চল হয় বলে, 'বাবুজি খানেকো ভি পয়সা নাহি খে।'

এ, এস, এম ধমকে ওঠে 'চোপ, তুই ভাবিস খুব চালাক। তোর মত এমন বহু ছ্যাঁচড়া লোকের কাছে মাশুল আদায় করেছি।'

আমার অল্প দিনের চাকরী তবুও মনে হল লোকটি সত্যিই গরীব। গাল ভর্ত্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ী। চোখ দুটো ঘোলাটে হয়ে গেছে। শরীরে বস্ত্র বলতে ঐ লেংটি।

বড়বাবুর নির্দ্দেশে লোকটির বাধা সত্ত্বেও ওর খানাতল্লাসী সুরু করে রামলগন। বড়বাবু, ছোটবাবু দাঁড়িয়ে থাকেন অফিসার সুলভ ভঙ্গিতে!

ভাবি আমি, খানা তল্লাসী আর কোথায় করবে। কিন্তু রাম লগন দক্ষ রেল পোর্টার। ওর লেংটির ভিতরে হাত চালিয়ে একটি কাগজের প্যাকেট বার করে।

লোকটার ঘোলাটে চোখেও হতাশার দৃষ্টি। সব খোয়ানোর আশঙ্কায় ও বিহ্বল। আমার ভীষণ কষ্ট হল। রামলগন প্যাকেটটা খুলে নিয়ে পয়সা গুণতে আরম্ভ করল। লোকটা হয়তো অনেক পরিশ্রম করে ঐ কয়টা মুদ্রা সংগ্রহ করে, সংগোপনে দেহের নিভৃত

অংশে লুকিয়ে রেখেছিল। হয়ত ঐ দিয়ে তার পরিবারের কয়েকটি মুখে কয়েকটি রুটির সংস্থান হত। কাবুলীওয়ালার মত জবরদস্তি ওই পয়সা কয়টা কেড়ে নেওয়াটা আমার খুব খারাপ লাগল।

থাকতে না পেরে বললাম, 'করছেন কি মশাই লোকটা সত্যিই বড় গরীব। রেল কোম্পানীকে কলা দেখিয়ে কত লোকই তো পা'র হয়ে যাচ্ছে পারের কড়ি না দিয়েই।'

'কি বললেন, ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে? তা যায়ই তো, নিত্যই যাচ্ছে। তবে ধরা পড়লে জরিমানা শুদ্ধ ভাড়া দেওয়াই তো আইন। আর আপনার যদি এতই দয়ার শরীর, ওর হয়ে ভাড়াটা দিয়েই দিন না। রেল কোম্পানীর ভাঁড়ারে কিছু পড়ুক'। ছোটবাবু আমাকে ব্যঙ্গ করে এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন।

চুপ করে গেলাম। এই বিদেশ বিভূঁই জায়গায় দাতব্য করবার মত অর্থনৈতিক অবস্থা আমার তখন ছিল না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ছোটবাবু দ্বিগুণ উৎসাহে আরম্ভ করলেন আবার 'তা গার্ডসাহেব নতুন চাকরী, বয়স অল্প, দয়া তো আপনার আসতেই পারে। তবে রেলকেও একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনাকে কোনও উপরওয়ালা দয়া করবে না। এই ত্রিশ বছর গোলামী করে সাতটা ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে কি কষ্ট তা পরে বুঝবেন। নিজের দিকটা নিজেকেই দেখতে হবে।'

আমি এবার ছোট বাবুকে খুশী করার জন্য বললাম, 'না আপনি ঠিকই বলেছেন। রেলে বিনা টিকিট অর্থই বে-আইনী, সেটা সমর্থন করি না তবে লোকটা দরীদ্র—'

বাধা দিয়ে বড়বাবু বললেন, 'ওর যদি মন খোলা থাকত—তা হলে লেংটের ভেতর পয়সা রাখবে কেন বলুন? ওর টে-ণ্ডে-ন্সী-ই হচ্ছে ফাঁকি দেওয়া।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করলাম। দেখি

ষ্টেশনের পেছন দিকের বারান্দায় প্রসাদ তার গার্ড বাক্সের উপর চুপটি করে বসে, ভোর বেলার বাতাস উপভোগ করছে। আমাকে দেখে বলল, 'চল একটু নদীর ধার দিয়ে ঘুরে আসি।'

স্টেশনের এলাকা ভর্ত্তি শুধু পাথর। না'না আকারের, না'না রঙ্গের পাথরের স্তুপ। স্তুপিকৃত পাথর দেখে আমি থ মেরে গেলাম। স্টেশন থেকে একেবারে নদীর পার পর্যন্ত সেই জমায়েত ভাঙ্গা পাথর। নিস্প্রান নয়। অসহায় জীবন্মৃত ওরা। মানুষের হাতের কারসাজিতে গৃহহীন ছন্নছাড়ার দল।

ওরা কি মানুষের কথাই বলছে? মানুষ নিজের জীবন যন্ত্রনায় পাগল হয়ে ঠিক নিজেদের মতই ওদেরকে শান্তির গৃহনীড় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। পাহাড়ের দেহ বিদির্ণ করে নিয়ে এসেছে। এক একটা পাথরের টুকরো এক এক জন মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। ওদের মধ্যে রয়েছে কোন হতভাগার নিস্ফল বেঁচে থাকার আকুল প্রচেষ্টা।

অসংখ্য মানুষের চাপে যেমন প্রকৃতি তার স্বাভাবিক চরিত্র হারিয়েছে তেমনি ঐ পাথরগুলোর বেষ্টনে চঞ্চলা, উচ্ছলা নদীটিও যেন হাঁস ফাঁস করছে। দুই দিকের চাপে অর্ধমৃত ঐ কল্লোলিনী স্রোতস্বিনী, কোন ক্রমে কুল কুল রবে বয়ে যাচ্ছে। পালিয়ে যেতে চাইছে ঐ পরিবেশ থেকে।

কিন্তু নদী নদীই। স্তুপীকৃত পাথরের বোল্ডারের চাপে অর্দ্ধমৃত, শীর্ণকায়া জলধারা কিন্তু তার স্বাতন্ত্র বজায় রেখেছে। স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে রেছে তার চা'রপাশ।

হঠাৎ কি জানি কেন উত্তর দিকের আকাশে, নীলবর্ণ মেঘের মত গুরুগম্ভীর হিমালয়ের দিকে চোখ পড়তেই মনটা যেন কেমন একটা আশঙ্কায় ভরে উঠলো।

ঐ দিকেই, ঐ হিমালয়ের পাদদেশেই আমাদের যাত্রা শেষ হবে। ওখান থেকেই সুরু হবে আমাদের আসল কাজ।

তখনও জানা ছিল না কি আছে কপালে। হয়তো একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। প্রসাদের ডাকে চমক ভাঙ্গলো, 'কিহে কাব্য চিন্তা করছ নাকি?'

বললাম, 'না প্রসাদ বাস্তব চিন্তা করছি।'

প্রসাদ হেসে উত্তর দিল, 'না, তুমি তো বাঙ্গালী, পাহাড় আর ঝরণা দেখলেই তোমাদের মনে কবিতা এসে যায় শুনেছি।'

পাঁচ

গিতালদহ ষ্টেশনে অসংখ্য লাইন পাতা আছে। তারই একটা অবহেলিত সাইডিং লাইনে আমাদের স্টোন ট্রেনখানা প্লেস করা ছিল। অভিনব প্রসাধনীতে সজ্জিতহয়ে যাত্রা আরম্ভ করতে প্রস্তুত। আমরা সকলে তৈরী হয়ে এলেই তার অভিসার সুরু হবে, জীর্ণ কতকগুলো বগী আর অনেকগুলো খোলা ট্রাক। সামনে জোড়া আছে বহুদিনের পুরোন এক ইঞ্জিন। ভোঁস ভোঁস শব্দ করে মাঝে মাঝে স্টীম ছাড়ছে।

ঢাকা বগীগুলোর অধিকাংশই অসংখ্য ছিদ্রে ভরা। বৃষ্টি বা রোদের সময় সম্ভবত জলও রৌদ্রের পর্যাপ্ত সরবরাহ দেওয়ার জন্যে। ওই বগীগুলোর বাসিন্দা হল, আমদানী করা পাথর ভাঙ্গা কুলি কামিনের দল।

ওদেরকে শাক, শব্জি, বা গরু ভেড়ার মত আমদানী করে আনতে হয়। নিয়ে আসে সরকারের বিশ্বস্ত ঠিকাদারেরা। বহু প্রলোভনে পড়ে গ্রাম ছেড়ে দলে দলে দরীদ্র মানুষেরা আসে ঠিকাদারের সঙ্গে। তারপর সারা জীবন কঠিন পাথরের বুকে নিষ্ঠুর আঘাত হানতে হানতেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়। এদের মধ্যে কেউ দেশে কখনও ফিরে যায় আরও দরীদ্র হয়ে। কেউ বা কঠিন ব্যাধির শিকার হয়ে অকালে প্রাণ হারায়।

এদের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী আছে। অবিবাহিত পুরুষ, নারী আছে এমকি অল্পবয়স্ক বালক বালিকাও আছে। কম বয়সী বালক, বালিকা ও মেয়েদের মজুরী সক্ষম পুরুষ কর্মীদের চেয়ে আরও কম।

তবে একটা ব্যাপারে এদের ঠিকাদার সাহেব খুবই দয়া দেখিয়েছে। জীর্ণ, ছাদফুটো মালগাড়ীর ভিতর এদের কে আশ্রয়

দিয়েছে। অবশ্য ঐ সমস্ত অকেজো এবং ভাঙ্গা ফুটো কামরাগুলি রেল সরকারেরই কৃপার দান।

নারী, পুরুষ, বালক, বালিকার কল-কোলাহল, উনুনের ধোঁয়া, জল, কয়লা সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই নিদারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ওরা যেন অসুখী নয়।

ঠিকাদারেরা এদের মজুরীর পয়সায় সাহেব হয়েছে। সাহেবের সঠিক অর্থ নিয়ে আলোচনা মুলতুবী রেখে শুধু এইটুকুই বলি যে সাহেব বৃটিশ আমলে যত ছিল তারপরে তার চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যায় দেখা দিয়েছে। এখন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিও অক্লেশে নিজেকে সাহেব বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ঠিকাদার যখন প্রচুর অর্থবান তখন নিশ্চই সে সাহেব। তার হৃদয়ও খরচার ব্যাপারে জায়গা মত বেশ উদার। যেমন ট্রেনের ড্রাইভারের জন্যে তিনি খুবই উদারহৃদয়। তার বন্ধুত্বের খাতিরে ড্রাইভার—ফায়ারম্যানও তার কুলির দলকে প্রয়োজন মত কয়লা দেয় তাদের রান্না-বান্নার জন্যে। অবশ্য সব কয়লাই নিয়ে আসা হয় রেল সরকারের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে। কাগজে কলমে কয়লার হিসাবগুলো, রেল সরকারকে অক্লেশে বুঝিয়ে দিতে তাদের কোন অসুবিধা হয় না।

আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট ব্রেকভ্যানে এসে দেখলাম আমাদের গার্ড বাক্স দুটি আমাদের পূর্বেই এসে হাজির হয়েছে। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল, প্রসাদকে বললাম, 'ষ্টেশনটা তো অনেক দূর, কিছু খাবারের বন্দোবস্ত করে ফেললে মন্দ হত না।'

প্রসাদ বলল, 'বন্দোবস্ত আর কি, চল নিজেরাই ষ্টেশনের স্টল থেকে কিছু খেয়ে আসি গে। এদের ট্রেন যে কখন ছাড়বে ভগবানই জানেন।'

আমি ব্রেকভ্যান থেকে নামতে গিয়ে রহস্য করে বললাম, 'ভগবান নয়; বল ঠিকাদার সাহেবই জানেন।'

প্রসাদ আর আমি হাঁটতে হাঁটতে চল্লাম ষ্টেশনের দিকে। যেতে যেতে প্রসাদ বলল, 'আমাদেরই ভুল হয়েছে, ষ্টেশনে খবর নেওয়া উচিত ছিল ক'টায় ট্রেন ছাড়বে।'

ষ্টেশনে আসতেই প্রথমে ঠিকাদার সাহেবের সঙ্গে দেখা, 'আরে গার্ড সাহব লোগ কঁহা গ'য়ে থেঁ?' বিগলিত ঠিকাদার গদগদ কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

প্রসাদ উত্তর দিল, 'ইউহি থোড়া নদী কিনারে ঘুম রাহেঁথে।' 'আইয়ে, কুছ নাস্তা পানি হো যায়, ভূখ তো জরুর লগা হোগা; ঠিকাদার সাহেবের সহৃদয় আপ্যায়নে সুবোধ বালক বনে যাই আমরা।

কেন জানিনা কোন উত্তর দিতেও পারলাম না, কোন প্রতিবাদও করতে পারলাম না। ওর সঙ্গে সুর-সুর করে ষ্টেশন রুমে যেয়ে হাজির হলাম। যেন ঠিকাদারই ঐ ষ্টেশনের সর্ব্বেসর্ব্বা!

দুটো প্লেটে প্রচুর খাবার তার সঙ্গে দুই পেয়ালা চা। ঠিকাদার সাহেব বললেন, 'আপলোক সুরু কিজিয়ে হাম আভি টি এক্স, আর সাহেব সে বাত করকে আতে হেঁ। বোলতেহেঁ দু'গাড়ী ডামিজ হো গয়া।'

আমি ইতস্তত: করছিলাম। প্রসাদ কিন্তু আমাকে ইশারা করে উত্তর দিল, 'ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায় আপ উন্‌সে বাত কর লিজিয়ে।'

ক্ষুধা নিবৃত হতে ধূমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

প্রসাদ বলল, 'এই টি, এক্স, আরের কত ক্ষমতা জানো? ইচ্ছে করলে আজ পুরো ট্রেনটার যাত্রাই বাতিল করে দিতে পারে। কারণ ট্রেনটার প্রতিটি বগীর যা চেহারা যে কোনটাকেই যখন তখন ডিফেক্টিভ বলে দিলেই হল।' একেবারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বুঝলে?'

ইতিমধ্যে দেখি স্টেশন মাস্টার ঘরে এসে ঢুকলেন কোত্থেকে, বললেন, 'কি মশাই, এবার আপনাদের রওনা করে দি দুর্গা দুর্গা বলে।'

বড়বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই টি, এক্স, আর-কে সঙ্গে নিয়ে ঠিকাদার সাহেব এসে হাজির। বিগলিত হাসি মুখে লেগেই আছে। 'লিজিয়ে সাহাব সব বন্দোবস্ত হো গয়া আপলোককে মেহের বানীসে। আপলোক বহুৎ ভলা আদমী হ্যায়—' ঠিকাদার সাহেব তার সন্তুষ্টি জাহীর করলেন।

ট্রেন ছাড়ার বন্দোবস্ত হতে আমরা সদলবলে অপেক্ষমান, অবহেলিত সাইডিং-এ হাজির হলাম। সঙ্গে স্টেশন মাস্টার এলেন না, এলেন সেই ছোটবাবু। ছোটবাবুর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দাঁত বার করে হাসার সময় তার দুপাশে দুটো কুকুর দাঁত যেন দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করে।

এ, এস, এম, লাইন ক্লীয়ারটা ড্রাইভারকে দিয়ে বললেন 'গার্ড সাহেব এই স্টেশনে এসে শুনেছিলাম বেশ দু পয়সা গুছিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু এখন দেখছি অষ্টরম্ভা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই পাথর চাপা পড়ে কপালটা একেবারে পাথরের মতই নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে।'

ড্রাইভার একটা দীর্ঘ হুইশেল দিয়ে কুলি কামিনদের সতর্ক করে দিল। একটা তাড়াহুড়া পড়ে গেল। সকলেই তাদের অবশিষ্ট জিনিষপত্র মালগাড়ীতে তুলে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ জলন্ত উনুন নিয়ে কেউ বা আধ রান্না ভাত তরকারি নিয়ে আবার কেউ বা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় ভাতের থালা নিয়েই গাড়ীতে উঠে পড়ল। এটা তাদের প্রতিদিনের অভ্যাস।

প্রায় পাঁচ মিনিট বাদে ঠিকাদার সাহেব এসে বললেন, 'গার্ড সাহেব আভি স্টার্ট কিজিয়ে।'

গাড়ী ছাড়বার সবুজ নিশান উড়িয়ে দিলাম। ড্রাইভার আরেক-খানা হুইশেল দিয়ে ইঞ্জিনটাকে নির্দ্দেশ দিল। ড্রাইভার-মাহুতের অঙ্কুশের আঘাতে সচকিত যন্ত্রকরি অগ্রসর হল তার পেছনে জোড়া বিশাল ট্রেনখানাকে নিয়ে।

ব্রেকভ্যানের মধ্যে এসে যখন বসলাম তখন ট্রেনখানা গিতাল'দা এলাকা ছেড়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে। চারিপাশ উজ্জ্বল রৌদ্রে ভরা।

রংপুর জেলার সীমানা ছেড়ে কোচবিহার স্টেটের মধ্যে দিয়ে নানা রকম আওয়াজ করে আমাদের ট্রেনখানা অতি মন্থর গতিতে চলেছে।

বিরক্ত হয়ে প্রসাদকে প্রশ্ন করলাম, 'ব্যাপার কি বলত এ যেন একটা গরুর গাড়ী চলেছে ?'

প্রসাদ বলল, 'এই এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এর চেয়ে বেশী জোরে চলা এর ধাতে সয় না। ক্ষমতায় কুলোয় না।'

তারপর অন্য প্রসঙ্গ টেনে এনে বলল, 'আরে তাতে আমাদের কি বল। দিন রাত চলতে দাও না। ও ব্যাপার রেল কোম্পানী বুঝুক। আমাদের স্পেসিফিক ডিউটি শেষ হলেই ওভার টাইমের মিটার চড়তে সুরু হবে '

'আর তা ছাড়া খুব তাড়াতাড়ি যেয়েই বা কি হবে। এই গাড়ীই এখন থেকে আমাদের ঘর বাড়ী। এখানেই তো বাস করতে হবে আমাদের।'

প্রসাদের বাক্যে চুপ করলাম ঠিকই। কিন্তু যাত্রার আরম্ভেই মনটা খিঁচড়ে গেল।

ক্রমে বেলা বাড়তে লাগল। কিন্তু ট্রেনের গতি বাড়বার কোন লক্ষণ নেই। এখন ভাবলাম কি ভুল করেছি। কিছু মাসিক পত্র-পত্রিকা সঙ্গে আনা উচিত ছিল।

প্রসাদের কিন্তু কোন দুঃখ নেই। জানালার ধারে বসে বসে মনের সুখে হিন্দি গানের কলি গাইছে।

হঠাৎ প্রসাদ কি যেন দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে এদিকে এস। কি বুড়ো মানুষের মত বসে আছ ? ঐ দেখ।'

মুখ বার করে দেখি কতকগুলো গ্রাম্য কিষাণ মেয়ে ক্ষেতে কাজ

করছিল, রেলগাড়ী দেখে খুব খুশী হয়ে হাত নাড়ছে। গায়ের রং তাদের মিশ কালো। পরণে স্বল্পবাস কিন্তু শরীরে যৌবন অটুট। রেলগাড়ী দর্শনে বিহ্বলা যুবতিরা যথেষ্ট বেআব্রু হয়ে পড়েছে। তাতেই প্রসাদের এত উল্লাস।

গাড়ী খুবই মন্থর গতিতে চলছিল। প্রসাদ হাত নেড়ে একটা অশালীন উক্তি করে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করল।

আমি ধমকে উঠলাম, 'প্রসাদ এগুলো কি হচ্ছে, আমরা না ভদ্রলোকের ছেলে। তাছাড়া সরকারের কর্মচারী।

প্রসাদ আমাকে পাল্টা ধমকে উঠলো, 'আরে রাখো তোমার ভদ্রলোক। যস্মিন দেশে যদাচারং। বুড়ো ভাম কোথাকার।'

বলেই প্রসাদ সেই অপসৃয়মানা যুবতিদের দিকে সমানে হাত নাড়তে থাকলো।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি একটু সাবালক হওতো।'

ওর দিকে চেয়ে আমি হেঁসে ফেললাম, বললাম, 'আচ্ছা এবার থেকে সেই চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু ওসব গেঁয়ো ভূতগুলোর মধ্যে তুমি কি দেখলে যে একেবারে উল্লাসে লাফিয়ে উঠলে? প্রশ্ন করলাম আমি।

'গেঁয়ো ভূতগুলোর মধ্যেই এখনও প্রকৃতি বাস করছে বুঝেছ? ওদের রংটাই কালো দেখলে আর ওদের শরীরের কাণায় কাণায় যে সতেজ সৌন্দর্য্য, তা আছে নাকি তোমাদের সহরের মেয়েদের? আমি তো কৃত্রিম প্রসাধনীতে আবৃত তথাকথিত আলট্রা মডার্নদের-কেই বলব সহুরে ভূত। ওদের কি আছে বিজ্ঞাপনের সাজ-সজ্জা ছাড়া! এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল প্রসাদ।

গাড়ী এই সময় একটা ব্রীজের উপর দিয়ে যাচ্ছিল। তার কর্ণ বিদারী ঝমা ঝম্ শব্দে প্রসাদের বাকি কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

আমি ভেবে দেখলাম প্রসাদের কথাগুলো হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট।

বেলা যতই বাড়তে থাকে রোদ্দুরে লোহার চাদরে ঢাকা ব্রেক ভ্যানটা ততই তেতে ওঠে।

সারা রাত ঘুম হয়নি বলে চোখ দুটো কট্ কট্ করছিল। আমি আরেকটা জানালায় মুখ বের করে বসলাম।

রোদ যত প্রখরই হোক না কেন উত্তর বাংলার গ্রামগুলোর একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য বিগুমান। দুপাশে চিরসবুজ, শুধু ফসলের মাঠ গুলোই নয়, সবুজ চারিপাশ। গাছপালাও প্রচুর আর যে দিকে আমাদের ট্রেনখানা চলেছে সেদিকে যেন পাহারাদার নীল হিমালয় দাঁড়িয়ে আছে। চিরকালের সজাগ প্রহরী।

মাঝে মাঝেই কৃষক পুরুষ রমণী, বালক শিশুর সমাবেশ, রেলগাড়ী দেখে সব হৈ হৈ করে উঠে। চোখে সূর্য্যের আলো পড়ছে তাই কপালে হাত রেখে রোদ ঢাকবার চেষ্টা করে। আমরা হাত নেড়ে ওদের অভিনন্দন গ্রহণ করি।

সমস্তদিন চলার পর এল রাত্রি। খাওয়ার জন্যে চিন্তা ছিলনা রেলকোম্পানীর দেওয়া পোর্টারের রান্নায় জঠরজ্বালা নিবারণ করলাম রাত্রি হতেই পালা করে আমি আর প্রসাদ খানিকটা ঘুমিয়ে নিলাম।

* * *

সারাদিন সারা রাত্রি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে খুব ভোরে আমাদের ট্রেনখানা যেখানে এসে পৌঁছল সে স্টেশনটির নামটি অদ্ভুত, 'রাজাভাত খাওয়া'

'রাজাভাত খাওয়া ছোট্ট এক জংশন। এখান থেকে এক লাইন দালসিং পাড়া, এক লাইন জয়ন্তী এবং আরেকটি লাইন যেটা দিয়ে আমরা এলাম সেই গিতালদহ হয়ে লালমনির হাট।

রাজাভাত খাওয়ার নাম যেমনই হোক স্টেশনটি কিন্তু এক মনোরম পরিবেশে তৈরী হয়েছে। চারিপাশে বিখ্যাত তরাইয়ের শালবন। কিছু কিছু কাটা গাছের স্তূপ আর কয়েকখানা সুন্দর কাঠের তৈরী রেল ও ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোয়ার্টার।

কাঠের তৈরী বাড়ীঘর যে অত সুন্দর হতে পারে ঐ প্রথম জানতে পারলাম। কি সুন্দরভাবে সাজানো রঙ্গীন কোয়ার্টারগুলো। মনে হচ্ছে যেন বায়স্কোপের ছবি দেখছি।

জায়গাটি আসলে গভীর বনেরই একটা অংশ। কত যে শালগাছ তার ইয়ত্তা নাই, নানা বয়স তাদের। শিশু যুবা বৃদ্ধ সবাই একত্রে বসবাস করছে। সহ অবস্থানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। শুনলাম জায়গাটি দিনের বেলায় যত সুন্দর রাত্রে কিন্তু ততই ভয়ঙ্কর। কারণ বন যখন আছে বন্য জন্তুরও অভাব নেই এবং দিনের চেয়ে রাত্রেই তারা অধিক সক্রিয়। খাবারের খোঁজে দলে দলে স্টেশন প্লাটফর্মের উপরেও তারা হামলা করে মাঝে মাঝেই।

কিন্তু আমাদের স্বপ্নময় পরিবেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই তিক্ত হয়ে উঠলো। স্টেশন মাস্টার এসে কমপ্লেন করলেন, 'মশাই আপনাদের কুলিদের একটু কনট্রোল করুন। ওরা যা শুরু করেছে আজই আমাদের টিউবওয়েল দু'টোর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটবে।'

আমি কোন উত্তর দেওয়ার আগেই প্রসাদ বাহাদুরী করে বলল, 'কনট্রোল কি করব বলুন; ওদের তো জল লাগবে, অতগুলো লোক জল কোথায় পাবে।'

খেঁকিয়ে উঠলেন স্টেশন মাস্টার, 'তার আমি কি জানি। আপনার কুলিদের জল লাগবে বলে আমাদের কল দু'টোর দফা রফা করতে হবে? এতো ভয়ানক জুলুম মশাই।'

আমি বুঝিয়ে বললাম, 'দেখুন ওরা তো আমাদের লোক নয়, ওরা সরকারী কাজে এসেছে। কাজেই সরকারী টিউবওয়েল থেকে ওরা জল নিলে আমরা কি বলব বলুন? তাছাড়া এখানে জলই বা পাবে কোথায়?'

ফল বিপরীত হোল। স্টেশন মাস্টার আরও বিরক্ত হলেন, 'সরকারী টিউবওয়েল নামেই সরকারী। ভাঙ্গলে পরে সারতে একবছর লেগে যায়। আর এই স্টেশন স্টাফদের ঐ টিউবওয়েল দুটোই সম্বল

তা জানেন ? কখন কখন সরকারী আশা ছেড়ে দিয়ে গাঁটের কড়িও ছাড়তে হয়।'

আমি উত্তর দিলাম ঠাণ্ডা মাথায়, 'শুমুন বড়বাবু আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন। ক'টা টিউবওয়েল কি ইঁদারা আছে তা জানবার কোন উপায় তো আমাদের নেই। তবে প্লাটফরমে টিউবওয়েল থাকলে তৃষ্ণার্ত্ত যাত্রীদের তা ব্যবহার করার অধিকার নিশ্চই আছে একথা মানেন তো ?'

আমার কথায় বড়বাবুর রাগ একটু কমলো হয়তো। কিন্তু হতাশ ভাবে বললেন, 'আপনারা তো একদিন অধিকার ফলিয়ে চলে যাবেন, আর এই এত স্টেশন স্টাফ তারা দীর্ঘকাল পানীয় জলের অভাবে দিন কাটাবে।'

আমি এবার বললাম, 'আচ্ছা টিউবওয়েলটা যাতে যথেচ্ছ ব্যবহার না হয় সে বিষয়ে কুলিদের সর্দারকে বলে দিচ্ছি। আর তবুও ভেঙ্গেই যদি যায় একটা মেসেজ দিবেন এমারজেন্সী—'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই এ, এস, এম, ছুটতে ছুটতে এলেন 'সর্ব্বনাশ বড়বাবু স্টোন ট্রেনের কুলিরা স্টেশনটা যাচ্ছেতাই রকম নোংরা করে যাচ্ছে। দুর্গন্ধে মাসখানেক এখানে টেকা দায় হবে।'

'দেখছেন তো গার্ডসাহেব দেখছেন ? এই স্টোন ট্রেন আর ব্যালাষ্ট ট্রেন স্টেশনে এলেই আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়।' বড়বাবু অসহায় ভাবে আমাদের দিকে তাকালেন।

প্রসাদ এতক্ষণে বলল, 'এও তো আজব ব্যাপার, রেলের কি সুইপার নেই না টিউবওয়েল সারাবার মিস্ত্রির অভাব আছে ?'

ইতিমধ্যে আমাদের চারিপাশে স্টেশন স্টাফদের একটা জটলা হয়েছিল। বড়বাবু বুক ফুলিয়ে এবার প্রসাদের কথার উত্তর দেন, 'শুমুন মশায় আপনার সরকারের সুইপারের কথা। তার পোষ্টিং আলিপুরদুয়ার। সপ্তাহে দুদিন এখানে কাজ করার কথা। তাও

যেদিন একটু বেশী পরিমাণে তরল পান করে সেদিন সে সুলতান। উল্টে আমাকেই কিছু পয়সা কড়ি দিয়ে ফিরতি ট্রেনে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হয়।

এ, এস, এম, ক্ষেত্রনাথবাবু তাগাদা দিয়ে বললেন, 'বড়বাবু যা হোক কিছু করুন। এদিকে জংবাহাদুর নোটিশ দিয়েছে কাল সারারাত ডিউটি দিয়ে এত বেলায় সে আর স্টোন ট্রেন সাণ্টিং করাতে পারবে না।'

বড়বাবুর সঙ্গে আমরা সকলেই স্টেশন ঘরের দিকে অগ্রসর হলাম। বড়বাবু বলতে লাগলেন, 'সুইপারের নামে দু-চারটে কমপ্লেন ফাইল করার পর একদিন এ, টি, এস, সাহেব এসেছিলেন, তার কাছে জানালাম। উত্তরে তিনি আমাকেই ধমকে বললেন, 'ও সব মিনিয়াল স্টাফদের বেশী ঘাটাবেন না। কোন রকমে ম্যানেজ করে নিন। আর একবার টিউবওয়েল গেলে আমি এ স্টেশনে থাকাকালীন আর সারানো হবে বলে মনে হয় না। ওরা ইঞ্জিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের লোক। ট্রাফিককে ওরা পরোয়াই করে না।'

আমরা স্টেশন ঘরের কাছে আসতেই কুলি সর্দারদের একজনকে পেয়ে গেলাম তাকে বেশ করে ব্যাপারটা নিয়ে ধমকে দিলাম। ও বলল, 'ঠিক হ্যায় বাবু হাম আভি দেখতা। আপ কো কোই সিকায়ৎ নাহি হোগা।'

ট্রেনটা অযথা ছাড়তে বিলম্ব হচ্ছে—গাড়ির সাণ্টিং-এর ব্যাপার নিয়ে। বড়বাবুকে বলতেই উনি একগাল হেসে বললেন, 'কি করব বলুন এ লোকটা আজ কয়েকদিন ক্রমাগত নাইট ডিউটি দিচ্ছে। ওকে জোর করতে পারি কি করে?'

প্রসাদ বিরক্ত হয়ে উঠে গেল স্টেশন রুম থেকে। একটু বাদে দেখি ঠিকাদার আর জং বাহাদুর পয়েণ্টস্‌ম্যানকে সঙ্গে করে নিয়ে এল সেখানে।

ঠিকাদার সাহেব নিভৃতকক্ষে স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বললেন ; তারপর দেখলাম আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান ঘটলো।

গাড়ী সান্টিং হতে লাগল। আমরা বড়বাবুর কামরায় বসে চা পান ও গল্প করছি। ছোটবাবু টেলিগ্রাফের যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে আমাদের কথায় দু'চারটে ফোড়ন দিচ্ছেন।

আমি বললাম, 'আপনাদের কোয়ার্টারগুলো ঠিক ছবির মত সুন্দর।

ক্ষেত্রনাথবাবু ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন, 'তা যা বলেছেন, একেবারে সুইজারল্যাণ্ডের কনট্রি-কটেজের মত। একেবারে ছবি। মশাই নর্থ বেঙ্গলের প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় ফুটো ছাদ দিয়ে যখন গল গল করে জল পড়ে তখনই সেটা মালুম হয়। ছেলেপুলে নিয়ে জলে ভিজে শীতে কাঁপতে থাকি। তখন মালুম হয় সরকার আমাদের কত সুখেই রেখেছেন।'

আমার মুখে কোন কথা ফুটলো না।

বড়বাবু এবার বললেন, 'সে তো হল বর্ষার সময় আর দৈনিক কি করে রাত কাটাই সেটা জানেন? রাতে বেরুন দুষ্কর। স্টেশন ঘরে, প্লাটফরমে বন্য জন্তুরা প্রায়ই মনের সুখে বিচরণ করে। আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় ডিউটিতে আসি এবং কাঁচের দরজার আড়ালে ওদের দিকে লক্ষ্য রেখে, প্রাণ হাতে করে কাজ করি।'

ছোটবাবু বললেন, 'নূতন তো আপনারা। যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গাও খুবই সুখের। দু'চারদিনের মধ্যেই পরিচয় পাবেন।'

প্রসাদের বুকের ভিতরটা ঐ প্রকাশ্য দিবালোকেও কেঁপে উঠলো। তার ঐ চমকে ওঠাটাও আমার নজর এড়িয়ে যায় নি।

ছোটবাবু বললেন, 'গার্ড সাহেব আপনাদের ট্রেন ছাড়তে আরও ঘণ্টাখানেক দেরী। আপনারা আর বসে থাকবেন না। সামনেই

একটা ছোট্ট রানিং রুম আছে এই সময় যেয়ে স্নান সেরে নিন। ঠাকুরকে খবর পাঠিয়েছি। তারপর যা হোক কিছু মুখে দিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।'

ছোটবাবুর এই আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। সত্যি রেলের কর্ম্মচারী-দের দুঃখকষ্টের কথা তারা ছাড়া আর বুঝবেই বা কে? এই বিদেশ বিভুঁয়ে ছোটবাবু রানিং রুমে সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছেন এটাই মস্ত কথা।

রানিং রুমের রেলের এপয়েন্ট করা পাচক এসে হাজির হল। লোকটা বিহারবাসী। বলল, 'চলিয়ে সাহাব খানা তৈয়ার হো গয়া।'

প্রসাদ বলল খাশ দেহাতি বোলি, 'কা হো মছলি উছলি মিলি?' ঠাকুর এক রহস্যময় হাঁসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, 'ক্যা বাবু ইস জঙ্গল মে মছলি থোড়েই মিলতি হ্যায়? ওহতো আপলোগকে যব মেহেরবানি কভি কভি হোতা তভি তো মিলতা। তব না জঙ্গলমে মঙ্গল হোতা হ্যায়?'

আমি বললাম, 'কেইসে মেহেরবাণী ঠাকুর?'

'আরে বাপ আপ জানত নাহি থে গার্ডবাবু লোক যব ট্রেন লেকর আতে হেঁ তো সাথমে মছলি ভি জোগার করকে লে আঁতে হেঁ। বলে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপলোগ নয়া মালুম হোতা।'

ওর বাচালতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাই বললাম, 'আচ্ছা বাবা চলো কিধার হ্যায় রানিং রুম।'

রাস্তায় যেতে যেতে ঠাকুর বলল, 'বাবু মছলি আপলোগকো খিলা দিউঙ্গা, উহ যো ঠিকাদার সাহাব হ্যায় না?

উহ্ এখানেও সেই ঠিকাদার সাহাব। আশ্চর্য লোকটার ক্ষমতা আর দৃষ্টিশক্তি। যেখানে হাত দিচ্ছি, সমস্ত সমস্যা যাদুমন্ত্রের মত উড়ে যাচ্ছে। কোন ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। আমাদের যে মাছ খাওয়ার অভ্যেস তাও লোকটার জানা আছে তাই এই সুদূর বনপ্রান্তেও মাছ

সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে। মনে মনে ভাবলাম কি এত ও রোজগার করবে। কত অগাধ সম্পত্তি সে আহরণ করবে ঐ পাহাড়ভাঙ্গা পাথর থেকে—যে মেঘ না চাইতেই সে জল এনে ফেলেছে আমাদের আপ্যায়ন করতে।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে পর্যাপ্ত বিশ্রাম করেও সন্ধ্যের আগে আমাদের ট্রেনটা ছাড়া সম্ভব হল না। আমাদের ট্রেনটা যখন প্লাটফরম পার হয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎ একজনের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেলাম, 'যাক বাবা আপদ বিদেয় হয়েছে।'

আবছা অন্ধকারে চেহারাটি ঠিক ঠাহর করতে না পারলেও গলার স্বরে প্রসাদ এবং আমি, দুজনের কারুরই চিনতে অসুবিধা হল না। লোকটা ছোটবাবু ক্ষেত্রনাথ।

॥ ছয় ॥

রাজভাত খাওয়া ছেড়ে অন্ধকার থেকে আরও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। দিনের বেলায় বনকে মনোহারিনী বলে মনে হয়েছিল রাতের অন্ধকারে তাকেই মনে হল ভয়ঙ্কর। অতীব ভীতিপ্রদ।

ট্রেনটা গুডস্ ট্রেন। তার কোনো কামরায় বিজলি বাতি জ্বলে না। যেগুলোর ভিতরে কুলিরা ছিল সেখানে কেরোসিন তেলের ডিব্রি জ্বলছিল। আর আমাদের কম্পার্টমেণ্টে রেল কোম্পানির দেওয়া হাতবাতি।

আমাদের ব্রেকভ্যানটা একদম শেষ বগী বলে ভীষণ লাফাচ্ছিল। ট্রেনের গতি পূর্ববৎ। বাইরে নিকশ কালো অন্ধকার। সব গাড়ীর দরজা যথাসম্ভব বন্ধ করা আছে। মন্থর গতি ট্রেনে কোন হিংস্র জানোয়ারের পক্ষে লাফিয়ে ওঠা মোটেও কঠিন নয়।

দু-পাশে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে সরল দীর্ঘ শালগাছগুলোকে কালো দৈত্যের মত মনে হচ্ছে। এক বিশ্রী ছন্দে, কানফাটানো আওয়াজ তুলে ট্রেনটা মন্থর গতিতে চলেছে। শালবনের ভিতরে তার যে প্রতিধ্বনি হচ্ছে তাও অত্যন্ত বিশ্রী, কটু।

পোর্টারটাকে ব্রেকভ্যানে তুলে নিয়েছিলাম। ও দু-পেয়ালা চা তৈরী করল অতি কষ্টে। শুধুমাত্র হাতবাতির স্বল্প আলোকে ও যে চা তৈরী করতে পেরেছে এটাই যথেষ্ট।

প্রসাদের ফুর্তি একেবারে নেই। সত্যি বলতে কি জঙ্গলের এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে আমাদের কেমন ভয় ভয় করছিল। শুধু ইঞ্জিনের শব্দ আর তার প্রতিধ্বনি কতক্ষণ সহ্য করা যায়? পোর্টারটার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলাম।

পোর্টারের সঙ্গে আলাপ করে কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। বুঝলাম রাত্রিটা আমাদের মালকামরার মধ্যেই কাটাতে হবে। প্রসাদ বনভূমীর অন্ধকার রাজ্যে এসে একেবারেই দমে গেছে।

হঠাৎ চারিদিক কাঁপিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হুইশেল বাজাতে বাজাতে আমাদের ইঞ্জিনের ঘণ্টায় দশ মাইল গতিবেগও যেন কমে আসতে লাগল।

হাতবাতির আলোয় দেখলাম রাত প্রায় সাড়ে নয়টা। প্রসাদ বলল, 'বোধহয় বক্সা রোড এসে গেল।'

সন্তর্পণে ব্রেকভ্যানের দ‚জা খুলে বাইরের বারান্দায় বেরুতে যাব পোর্টারটা চিৎকার করে উঠলো, 'গার্ড সাহেব ইয়ে কেয়া করতে হেঁ পহলে বাহার মে দেখ লিজিয়ে আচ্ছি তরহ সে।'

থমকে গেলাম, সত্যি তো এই অন্ধকারে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে অসাবধানে বেরিয়ে যাওয়া যে কতবড় বোকামী সেটা বুঝতে পেরে লজ্জিত হলাম।

গাড়ীটা ততক্ষণে থেমে গেছে একেবারে। পোর্টারটা বলল, 'ঠাহরিয়ে হামকো যানে দিজিয়ে।'

হাত বাতিটা হাতে নিয়ে প্রথমে ব্রেকের বারান্দাটা দেখে অতি সতর্কতার সঙ্গে বারান্দার উপরে গেল, তার পেছনে পেছনে বেরুলাম আমি ও প্রসাদ। হাণ্ডেলটা ধরে মুখ বার করতেই দেখি আউটার সিগনালের চোখ লাল আগুনের মত জ্বলছে।

প্রসাদ বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি এমন রাজকাজ করছে যে এই জঙ্গলের মধ্যে গাড়ীটাকে আউটসাইড করল। রেলের স্টাফেরা সব জায়গায় সমান। যত সব কুঁড়ের দল।'

প্রসাদের কথার উত্তর দেওয়ার আগেই একটা চতুষ্পদ ছায়া মূর্তি যেন চকিতে রেল লাইনের এপার থেকে ওপারে ছুটে গেল। জন্তুটার আকার অনেকটা শেয়ালের মত। হাতবাতিটা একটু তুলে ধরে দেখবার চেষ্টা করল প্রসাদ কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আর একটা

বিশাল বলশালি জন্তু সেটার পেছনে আরও দ্রুত গতিতে ছুটে গেল। দুজনেই ঘন জঙ্গলে গা ঢাকা দিল।

ভয়ে আমাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। পোর্টারটি বলল, 'বাবু গাড়ী মধ্যে চোলেন। হিঁয়া রহনা খুব খতরাকে বাত আছে।'

আমরা চকিতে আবার ঘুরেছি। সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের অদূরে একটা ঝটাপটির শব্দ তারপর একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ এবং ক্রমশ: তা যেন দূরে সরে যেতে লাগল। তারপর সেটা থেমে গেল। আবার চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল। শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকার একতান আর তার মধ্যে আমাদের ইঞ্জিনের শব্দ। একঘেঁয়ে, বিরক্তিকর শব্দ বনরাজ্যের নিস্তব্ধতাকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

আমরা লক্ষ্মী ছেলের মত শান্ত হয়ে বসে আছি। গায়ে. ইউনিফর্ম থাকলে কি হয় বনের মধ্যে স্পেশাল মশা আমাদের স্পেশাল রিসেপ্‌শন করছিল। পটাপট শব্দ করে আমরা যথাসাধ্য রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। জন্তু-জানোয়ারের রক্তপানে অভ্যস্ত মশককুল হঠাৎ মানুষের রক্ত পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে প্রাণের ভয় তুচ্ছ করেও আমাদের সমানে আক্রমন করে চলেছে।

বসে আছি তো আছিই। ড্রাইভারটাও যেন কেমন। আরও দু'একবার হুইশেল বাজাতে দোষ কি।

হঠাৎ মনে হল দূর থেকে বহুলোকের মিলিত কণ্ঠের কোলাহল। সে কোলাহল ক্রমশ: আমাদের কানে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। হাতবাতির স্তিমিত আলোতে আমরা ভূতে পাওয়া মানুষের মত বসে আছি।

প্রসাদ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে কথা বলল প্রথম, 'আই বাপ! শালা ডাকাত টাকাত মনে হচ্ছে!'

আমি বললাম, 'ডাকাত আর আমাদের কাছে কি পাবে বল।' আমাদের সঙ্গের পোর্টারটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে তোমার কি মনে হয়?'

লোকটি মাথা চুলকে ভাঙ্গা বাংলায় উত্তর দিল, 'হামি বুঝতে পারি না, মালুম হচ্ছে শের কি হাঁথি বাহির হলো। উস্ লিয়ে সব একঠা হয়ে—তাড়া করলো।'

ওর কথাটা যুক্তিযুক্ত মনে হল।

কিন্তু কারুরই বাইরে বেরুতে সাহসে কুলোয় না। ঘাপটি মেরে দুরু দুরু বক্ষে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সেই সময়কার মনের অবস্থাটা ঠিক বোঝাতে পারছি না তোমাদের।

যাই হোক কল কোলাহল মত্ত জনতা ক্রমে আমাদের ব্রেক-ভ্যানের পাশে এসে পড়ল। জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে স্পস্ট দেখতে পেলাম ওদের হাতে জ্বলন্ত মশাল, বর্শা, লাঠি এবং আরো অনেক দিশী হাতিয়ার। লোকগুলো কিন্তু সাদাসিধে।

আমাদের কাছে এসে আমাদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'গার্ড সাহেব ঘাবরাইয়ে মৎ, হমলোক টিশনকে ইষ্টাফ্ হ্যায়।'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। সত্যিই এরা স্টেশন স্টাফ্ই বটে, আমাদের মত নিরীহ। রেল কোম্পানী এদের পাঠিয়েছে বন্যপ্রাণীদের শিকার হওয়ার জন্যেই।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম কিছুক্ষণ আগে গুমতি থেকে একজন পয়েণ্ট্সম্যানকে বাঘে তুলে নিয়ে গেছে। এরা ওর প্রাণ বাঁচানোর ব্যর্থ চীৎকার শুনতে পেয়েছে, তাই দল বেঁধে ছুটে এসেছে মশাল জ্বালিয়ে যদি হতভাগাকে উদ্ধার করা যায়।

ওরা আমাদের দরজা বন্ধ করতে বলে সদলবলে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল হট্টগোল করতে করতে।

কিছুক্ষণ বাদে ওরা ফিরে এল লোকটার ছিন্নভিন্ন দেহ বহন করে। তারপর স্টেশনের দিকে ওরা রওনা হল।

আমরা পূর্ব্ববৎ বসে রইলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। লোকটা বেরিয়েছিল ডিউটি করতে। কিছুক্ষণ আগেও সে জানতো না যে এই তার নিয়তি। মুহূর্তের অসতর্কতার ফলে তার জীবনটা

অকালে ধ্বংস হয়ে গেল। কোথায়, কত শত মাইল দূরে তার দেশ। তারা কেউ জানল না, রেলের চাকরী করতে গিয়ে অকালে বাঘের মুখে তার জীবনের অন্ত ঘটলো।

আমাদের কপালেই বা কি আছে কে জানে। আমরাও তো ওদেরই দলের। অমনি অসহায়, অমনি সম্বলহীন রেলের চাকুরে।

তখন অনেক রাত। ট্রেনটা একটা হুইশেলের সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল। তারপর এঁকিয়ে বেঁকিয়ে চলল বনপথের মধ্যে দিয়ে, ধীর গতিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে ট্রেন এসে দাঁড়াল বক্সা রোড স্টেশনে।

বক্সা রোডে ট্রেন দাঁড়াতে দেখি, চার পাঁচজন স্টাফ মশাল হাতে প্লাটফরমের উপর দাঁড়িয়ে আছে। বড়বাবু অত্যন্ত বিরক্ত। কার উপর কে জানে। আমরা স্টেশন রুমে ঢুকতেই বললেন, 'আরে ভাই এসব জায়গায় কখনও আসতে আছে? এই নিয়ে আমার তিনজন পয়েন্টস্‌ম্যানকে বাঘে নিয়ে গেল। এই নিরীহ মানুষগুলোর জীবন এভাবে নষ্ট হওয়ার জন্যে এখন আমার নিজেকেই দোষী বলে মনে হচ্ছে।'

দূরে কুলি কোয়ার্টার থেকে কান্নার করুণ সুর ভেসে আসছে। আমি এই ব্যাপারে অজ্ঞ তবুও যা জানতাম বললাম, 'বড়বাবু এটা নিশ্চয় একই বাঘের কীর্তি। সাধারণতঃ সব বাঘই 'ম্যানইটার' নয়। তার যে একবার মানুষ খেতে সুরু করে তার মানুষ ছাড়া অন্য কিছুতে রুচি আসে না।'

আমার কথা শেষ হতে প্রসাদ সেই কথার জের টেনে বলল, 'তা বাঘটাকে মারবার ব্যবস্থা করলেই হয়।'

এ, এস, এম, এবার উত্তর দিলেন, 'কেউ ভ্রুক্ষেপ করে না। রেলের নিম্নশ্রেণীর কর্মী মরলে কারুরই কিছু আসে যায় না। ধর্মের উপর নির্ভর করে আমরা বাস করছি এখানে।'

আমি বললাম, 'সত্যিই এতগুলো লোক প্রাণ হাতে করে কাজ করছে আর গভর্ণমেন্ট এরকম উদাসীন, চমৎকার ব্যবস্থা!' মনে মনে

ভাবছিলাম আমাদের চমৎকার আদর্শ আর নিয়োগ কর্তাদের বিচিত্র বদান্যতার কথা।

বড়বাবু করুণ কণ্ঠে বললেন, ম্যানইটার একটা না অনেকগুলো তা বলা মুশকিল। কোয়ারীতে ঠিকাদার, কোয়ারী ম্যানেজারদের যে সব তাঁবু আছে সেখান থেকেও তো অনেক লোককে প্রায়ই বাঘে নিয়ে যায়। ওদের অবশ্য তাঁবু রক্ষার জন্যে বন্দুকধারী দারোয়ান আছে। ওরা কিছুদিন আগে একটা বাঘ মেরেও ছিল। বিরাট কেঁদো বাঘ। একেবারে খাঁটি রয়েল বেঙ্গল।' বড়বাবু থামলেন।

এদিকে খিদেয় পেটের নাড়ি ভুঁড়ি হজম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। বড়বাবু বললেন, 'আপনারা ব্রেকভ্যানের মধ্যে খুব সাবধানে দরজা বন্ধ করে থাকবেন রাত্রিতে। এটাই এখন আপনাদের কোয়ার্টার।'

দুজন পয়েন্টস্‌ম্যানকে একসঙ্গে মশাল জেলে পাঠিয়ে দিলেন। হুকুম দিলেন অমাদের গাড়ীটাকে একেবারে জঙ্গলের ধার ঘেঁসে যে সাইডিং আছে সেখানে প্লেস করতে।

আমরা গাড়ীতে যেয়ে উঠলাম। সঙ্গে রাজাভাতখাওয়া থেকে আনা পাঁউরুটি আর রানিং রুম থেকে আনা মাছের ঠাণ্ডা ঝোল ছিল; তাই দিয়ে সে রাতের মত আহার সেরে ঘুমোবার উদ্যোগ করলাম।

এদিকে কুলিদের কোন চিন্তা নেই, এর মধ্যেই ওরা প্রায় সকলেই নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েছে। বুঝলাম এই জায়গায় আসা ওদের নূতন নয়। ওরা এখানকার ভীষণতার সঙ্গে পরিচিত।

রাত্রে কোন ট্রেনের আসা যাওয়া নেই। চারিপাশ নিস্তব্ধ, যাকে বলে ডেড্‌ সাইলেণ্ট, শুধু বনভূমির বিচিত্র নানা রকমের শব্দ যার প্রতিটিই আমাদের কাছে অভিনব। শুধু অভিনবই নয় অপরিচিত এবং অবাঞ্ছিতও বটে।

আমাদের বন্ধ আবাসের বাইরে কারা যেন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, গাছের উপর মাঝে মাঝেই এক ধরনের লুটোপুটির শব্দ। এই দুর্ভেদ্য বনভূমির অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়াবহ পরিবেশকে উপেক্ষা করে যারা

চলতে পারে কিংবা জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যারা চলতে বাধ্য হয় তারাই শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মাঝে প্রতিনিয়তই কারা অরণ্যের ক্ষুধা মিটাবার জন্য জীবন দিচ্ছে। যেমন একটু আগে বলি হল সেই পয়েন্টস্‌ম্যান। এখানে ঘোর অরাজকতা। যে অন্যের জীবন নিয়ে নিজের জীবন বাঁচাতে পারে সেই বেঁচে থাকবে। কিংবা হয়তো বনরাজ্যের এইটাই সুশৃঙ্খল আইন। প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশ।

হঠাৎ কার অট্টহাসিতে চোখ জড়িয়ে আসা তন্দ্রাটা টুটে গেল। কেমন যেন ভৌতিক সে হাসি। এর মধ্যে যদি আবার ভূত প্রেত দৈত্যিদানার আবির্ভাব হয় তো নির্ঘাৎ পরদিন আমার অন্তর্ধান ঘটবে। সিক্ রিপোর্ট করে আমি পালিয়ে বাঁচব।

আস্তে আস্তে প্রসাদকে ডাকলাম। একটু থেমে থেমে আবার সেই ভয়ানক রক্ত জলকরা অট্টহাসি। প্রসাদ শুনলো কান পেতে তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'ও কিছু না শেয়ালের মত এক রকমের জীব। হায়েনার ডাক।' মনে পড়লো সত্যিই তো লোক তো বলে হায়নার অট্টহাসি।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি করে জানলে?'

প্রসাদ ঘুম জড়িত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের গ্রামের দিকে ওরা মাঝে মাঝে হানা দেয়. সুযোগ পেলে বাচ্চা শিশুকে পর্য্যন্ত ঘরের থেকে তুলে নিয়ে যায়।' তার পর প্রসাদ বলল, 'গাড়ীর ভিতর কোন ভয় নেই ঘুমিয়ে পড়।'

নানারকম চিন্তা করতে করতে কোন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি।

॥ সাত ॥

সব রাত্রিরই শেষ হয় এক সময়। বক্সা রোডে আমাদের প্রথম রাত্রি শেষ হল। সারারাত আমরা মরার মতো ঘুমিয়েছি। ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন বনানীর ভিতরে ভোর নেমে আসেনি।

রাত্রি শেষের নবীন উষা পাহাড়ের মাথা পার হয়ে—কেবল শালবনের মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাইতেই খুশীতে উদ্বেল হয়ে জানা অজানা সমস্ত পাখীর দল, স্নিগ্ধ উষার বন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছে।

রাত্রি যে অত সুন্দর করে প্রভাত হয় তা আমার জানা ছিল না। বক্সা রোডে মালগাড়ীতে বসে ঐ স্বর্গীয় সঙ্গীতের মধুর সুরে আমার ঘুম ভাঙ্গলো। সত্যি বলতে কি আমার জীবনের অত সুন্দর সকাল খুব কমই এসেছে।

ভয়ঙ্কর রাত্রির ভীতি মন থেকে মুছে গেল। ভুলে গেলাম যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই আমি সিক্ রিপোর্ট করে পালিয়ে আসার প্ল্যান করেছিলাম। আমার মন বলতে লাগল যেন আমি ওখানেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।

ধীরে ধীরে দিনের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। মালগাড়ীর দরজা খুলে ব্রেকভ্যানের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। রাত্রিবেলায় যে জায়গায় জীবনের ভয়ে আকুল হয়েছিলাম, দিনের আলোয় সেই স্থানকে মনে হল স্বর্গের নন্দন কানন।

আমি তন্ময় হয়ে গেলাম। ঘোর কাটল প্রসাদের ডাকে, 'কি হে পাখীর ডাকেই পেট ভরবে, না কিষণকে ডেকে চা-টা খাওয়ার ব্যবস্থা করবে?'

বললাম, 'কোন তাড়া আছে কি?'

'তাড়া নেই?' প্রসাদ আমার কথায় বিস্মিত হয়ে উত্তর দিল, 'একটু বাদেই তো আমাদের কোয়ারী সাইডিং-এ নিয়ে যেয়ে ফেলবে তখন কি করবে।'

নিস্পৃহ কণ্ঠেই বললাম, 'আমাদের গাড়ীতেই তো মজুত আছে সব কিছু। তোমার কিষণও আছে চায়ের সরঞ্জামও আছে।'

প্রসাদ বলল, 'তা আছে তবে ঘুম থেকে উঠে এক পেয়ালা চা না হলে—তুমিই বল?'

প্রসাদের কথায় সায় দিলাম 'সেটা ঠিক অবশ্য।' মনে মনে ভাবলাম আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাণী 'চা পান না বিষপান' কথাটা সম্পূর্ণ বিফলেই গেল।

কিষণকে ডাকবার আগেই সে এসে হাজির হলো। ড্রাইভারের কাছ থেকে একটু গরম জল এনে চা করে দিল। সঙ্গে পাউরুটিতে জেলী মাখিয়ে বেশ মোটা দুটো করে খণ্ড।

ইতিমধ্যে ছোটবাবু এসে হাজির 'আপনাদেরকে এখনই কোয়ারী সাইডিং-এ পাঠিয়ে দেব, সময় নষ্ট করে লাভ কি?'

একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে চাল ডাল আনাজ ইত্যাদি সব আছে কি? না থাকে তো ব্যবস্থা করতে হবে।'

আমি বললাম, 'এখানে কি হাট বাজার আছে?'

উনি উত্তর দিলেন 'এখানে নেই, জয়ন্তী থেকে আনাতে হবে।

আমি ব্যাগ থেকে পাঁচটা টাকা বার করে ছোটবাবুর হাতে দিয়ে বললাম, 'আজকের মত একটু ব্যবস্থা করে দিন, তারপর আমাদের ঘরকন্নার ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করে নেব।'

এবার ছোটবাবু বললেন, 'আজকের দুপুর বেলাটা তা হলে এই অধীনের কুটিরেই—অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে।'

আমরা বাধিত হলাম। তাছাড়া উপায়ও ছিল না, ওখানে কোন হোটেলও নেই।

ছোটবাবুর নির্দ্দেশে লাইন ক্লীয়ার নিয়ে আমাদের ইঞ্জিনের

ড্রাইভার তৎপর হল। এবারে ঠিক আমাদের ব্রেকভ্যানের পেছনে ইঞ্জিন লেগেছে। গাড়ীটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে প্রচণ্ড শব্দে। ওখানে ইঞ্জিন ঘোরবার টার্ণটোবল নেই। ফলে এই ব্যবস্থা।

ফোঁস ফোঁস করতে করতে ইঞ্জিন গাড়ীটাকে ঠেলতে লাগল। গাড়ী এঁকেবেঁকে শরীরখানাকে দুমড়ে মুচড়ে ক্রমশঃ সম্মুখে এগিয়ে চলল। বক্সা রোড থেকেই চারিপাশে পাহাড়। রেললাইন ক্রমশঃ পাহাড়ের উপরেই উঠছে বলে মনে হল।

ধীরে ধীরে নিপুণ পর্ব্বতারোহীর মত পুরো দলটাকে টেনে নিয়ে উপরে উঠতে লাগল দলপতি ইঞ্জিন। পাহাড়, পর্ব্বত, ঝর্ণা, বন এর প্রত্যেকটিই আমার কাছে একেবারে নূতন। বাঙ্গলা দেশের সমতলের মানুষ আমি। তাই পাহাড় জঙ্গল দেখে আমার মনে অদ্ভুত ফুর্ত্তি হয়েছে। মাঝে মাঝে চঞ্চল জলধারা পাহাড়ের গা গড়িয়ে বয়ে চলে যাচ্ছে নিচের দিকে।

প্রায় এক দেড়মাইল চলবার পর গাড়ীটা থেমে গেল। মুখ বের করে দেখলাম সামনে এক বিশাল পাহাড় রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রসাদ বলল 'ব্যাস যাত্রা শেষ, এবার কাজ সুরু। চল নামা যাক এবার।'

দুজনে নামলাম। সামনের দিকে জঙ্গলটা অনেকটা ফাঁকা। হৈ হৈ করে লাফিয়ে লাফিয়ে কুলিরাও সব মালগাড়ী থেকে নামতে লাগল। কুলিদের মেয়েরা আমাদের চেয়েও স্মার্ট। ঝপাঝপ্ সব লাফিয়ে পড়ল গাড়ী থেকে এমন কি বালক বৃদ্ধরাও।

একটা গাড়ী থেকে ঠিকাদার ও তার সরকার এবং আরও দুই একজন কর্ম্মী নেমে এল।

আমি ও প্রসাদ ধীরে ধীরে কোয়ারীর দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে এক দুরন্ত ঝোরা। প্রপাত বললে ভুল হবে। কারণ জলধারা খুব পুষ্ট নয়। তার মাঝখানে এক

চওড়া খাতের সৃষ্টি হয়েছে। তারই·দুই পাশে পাহাড়ের হাড়গোড় খানিকটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

জলধারার দুই পাশে স্তূপিকৃত হয়ে আছে অসংখ্য ছাই ছাই রঙের পাথর। নানা রকম তাদের আকৃতি। কুলিরা কিন্তু এসেই কাজে লেগে গেল। ঠিকাদার ও তার সরকারের নির্দ্দেশে ওরা পাথরের স্তূপ থেকে বড় বড় পাথর নিয়ে ঝুড়ি ভর্ত্তি করে, তারপর এক এক জনের মাথায় তুলে দেয়। ওরা সেগুলো নিয়ে মালগাড়ীর খোলা ট্রাকের সম্মুখে এসে সেখানে যে কুলি আছে সে ঝুড়িটা নিয়ে পাথর খালি করে ঝুড়িটা ফেরৎ দেয়।

এই ভাবে ওদের কাজ চলতে লাগল। আমি আর প্রসাদ ওদের কাজ দেখে হাঁ হয়ে গেলাম। মেয়েগুলো সত্যিই আশ্চর্য্য। পুরুষদের চেয়ে ওরা কম শক্তি ধরে না। স্বল্পবাস, গায়ে জামা পর্য্যন্ত নেই। অনেকের কিন্তু কি স্বাস্থ্য। সমস্ত শরীর ওদের পরিশ্রমে ঘেমে উঠছে। কিন্তু তার মধ্যে মুখে হাসি লেগেই আছে।

কিছুক্ষণ ওদের কার্য্যকলাপ দেখার পর প্রসাদ হঠাৎ বলল, 'আরে কেশরী মল কোথায় গেল?' দেখলাম সত্যি তো কেশরী মল কাছাকাছি কোথাও নেই। ও'র কর্ম্মচারীরা পাথর বওয়া ও পাথর বোঝাইয়ের কাজের তদারকি করছে। কিন্তু ঠিকাদার সাহেব বেমালুম অদৃশ্য।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, 'বাঘে টাঘে ধরেনি তো?'

প্রসাদ হো হো করে হেসে উঠলো, বলল, 'সত্যিই তুমি একটা উজবুক। এতগুলো লোকের মাঝ থেকে ওকে বাঘে ধরে নিয়ে গেল আর ও একটা টু শব্দ পর্য্যন্ত করল না তা কি হয়।'

আমি বোকা বনে গেলাম। লজ্জিত হলাম নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায়। বললাম, 'তাহলে ওর ঐ সরকার কে জিজ্ঞেস করি'।

কেশরী মলের সরকারকে জিজ্ঞেস করতেই ও আঙ্গুল দিয়ে জঙ্গলের একটা দিক দেখিয়ে দিল।

প্রসাদ প্রশ্ন করলো, 'উহা কিয়া করতা ?'

লোকটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রসাদের দিকে চেয়ে একটু চোখ মটকালো, 'যাইয়ে না সাহাব, আপভি যাইয়ে, উহ আপসে নারাজ নাহি হোঙ্গে।'

আমি আর প্রসাদ পায়ে পায়ে অগ্রসর হলাম। ঝোড়ার একটা জলধারা বয়ে যেয়ে পাশের গাছপালার আড়ালে ঢুকেছে। এখানে শুধু শালগাছ নয় আরও অনেক রকমের বিশাল আকারের গাছ আছে, শিমূল গাছও আছে গোটাকতক।

কত যে রং বেরং এর ফুলগাছ তাদের অনেকগুলোরই নাম জানা নেই। আবার কতকগুলি সাধারণ ফুল পাহাড়ের গায়ে গায়ে ফুটে আছে। হলদে রঙের জায়গাটা দূর থেকে সরষেক্ষেতের মত দেখাচ্ছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য হলাম ওখানে মাছরাঙা জাতীয় পাখীর সমাগমে, ঐ সদ্য পাহাড় থেকে নেমে আসা কনকনে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে মাছ জন্মালই বা কি করে আর খরস্রোতের মধ্যে আছেই বা কিভাবে ? মাছ নিশ্চয়ই আছে নইলে ঐ মাছরাঙাগুলো দলে দলে একই কায়দায় অথৈ শূন্য থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলতল স্পর্শ করেই আবার উড়ে যাচ্ছে। নিশ্চিত শিকার পাওয়ার আশা না থাকলে ওরা কখনই এমন দলে দলে জমায়েৎ হত না।

পাহাড়ের গায়ে মাঝে মাঝে দু'চারটে কুটির। পূবদিকে পাহাড়ের গায়ে চা বাগান। একেবারে পাহাড়ের নিচে পর্য্যন্ত থাকে থাকে সাজানো।

আমরা ঐ জলধারার ধারে এসে পৌছুলাম। চা বাগানটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

জলস্রোতের ধার দিয়ে সরকারের নির্দেশ মত শালগাছ ঘেরা বনটার মধ্যে প্রবেশ করলাম। এখন দিনের বেলা একটুও ভয় হচ্ছে না। প্রসাদ হঠাৎ আমায় একটা ঠেলা দিয়ে বলল, 'এই চুপ কর, মজা দেখ', প্রসাদ আঙ্গুল দিয়ে দেখাল।

অনেকগুলো নারী কণ্ঠের কাকলি। মেয়েরা যেন প্রচণ্ড স্ফূর্ত্তিতে মাতোয়ারা হয়ে কোলাহল করছে। অনেকগুলো মেয়ে, দূর থেকে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ে ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যায় না।

দুই বন্ধু নিঃশব্দে অগ্রসর হলাম। ওরা কারা, সেই পুরাকালের মত স্বর্গের অপ্সরা বা কিন্নরী নাকি? ওরা কি মর্ত্তে নেমে এল জলকেলী করতে? হঠাৎ প্রসাদ হাত ধরে আমায় থামাল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রসাদ কিছু বলবার আগেই চোখে পড়ল কেশরী মল একটা শিমূল গাছের গোড়ায় উঁচু ঢিবিতে বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে।

আমরা খুব নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই ঢিবিটার উপর উঠতেই সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল।

সামনেই সেই শীর্ণকায়া পাহাড়ী স্রোতস্বিনী। জল জমিয়ে একটা গোলাকার জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। তার পাশ দিয়ে নদীটা বয়ে চলে গেছে আর একদিকে।

ঐ প্রাকৃতিক জলাশয়ে স্নানমত্তা এক ঝাঁক সুন্দরী তরুণী। কেউ কাপড় কাচছে। কেউবা নাম মাত্র বস্ত্রের আবরণে সিক্ত দেহে স্নান করছে।

আমরা হাঁ হয়ে গেলাম। স্থানীয় পাহাড়ী মেয়ে ওরা। ওদের মধ্যে ঐ নির্জ্জন বনভূমিতে ওরাই আমাদের কাছে অপ্সরার মত সৌন্দর্য্য মণ্ডিতা বলে বোধ হচ্ছিল। বন পাহাড় আর চঞ্চলা ঝরণার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে ওদেরই তো মানায়। একটা মেয়েকে আরও দু'জন তাড়া করেছে তারপর তাকে জোর করে জলের মধ্যে টেনে এনে ডুবিয়ে দিল। সেও খানিকটা দূরে গিয়ে সাঁতার দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াল।

খাঁটি প্রাকৃতিক পরিবেশে মেয়েদের জলকেলি এবং নগ্নপ্রায় রমণীদের যৌবনচ্ছল স্নান কোন্‌না যুবককে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে?

এ দৃশ্য লুকিয়ে একা দেখা যায়, নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু সভ্যতায় কিছু শিক্ষা দীক্ষা থাকলে বেশীক্ষণ এদৃশ্য সহ্য করা যায় না। বিশেষ করে নিজের মনের ভিতর যে বাসনাই থাকনা কেন অপরের সামনে নিজের রুচীর নীচতাকে তুলে ধরা যায় না।

আমিই প্রথম প্রসাদকে বাধা দিলাম সসঙ্কোচে, 'প্রসাদ বাদ দাও, ওরা দেখতে পেলে কি ভাববে।'

প্রসাদ বলল, 'তুমি বড় ভীতু—'

আমি প্রসাদের হাত ধরে টেনে বললাম, 'হ্যাঁ আমি ভীতু, কাপুরুষ যা বলবে বল, বরং চল কেশরী মলকে ধরি।'

প্রসাদ আর আমি কেশরী মলের পেছনে যেয়ে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করি। প্রসাদই প্রশ্ন করল, 'কেয়া কেশরী মল সাহাব কিয়া দেখ রহে হৈঁ?'

চমকে উঠল কেশরীমল, তারপর আমাদের দেখে একগাল হেঁসে বলল, 'আরে গার্ড সাহেব লোক, আসেন আসেন। বিনা পয়সাকে সীনেমা হোতা হ্যায়। কিয়া করেঙ্গে, ইসে জঙ্গলমে মিলতাহি কেয়া হ্যায়। মুফৎ কো যো মিল যায়।'

আমি বললাম, 'বিনি পয়সায় পরস্ত্রীকে লুকিয়ে দেখা তো ভাল না ঠিকাদার সাহেব।'

কেশরী মলের মুখে রহস্যময় হাঁসি ফুটে উঠলো। চোখের দৃষ্টি চকিতের জন্য কুটিল হয়ে উঠলো তারপর বলল, 'বাবুজি আপনা ঘর ছোড়কে এতনা দুর আয়া সির্ফ পেটকে খাতির। ইস জঙ্গলমে অগর কুছ মৌক্কা ইস্তেমাল নাহি রহেগা তো ইস রেগীস্থান মে রহেগা কেইসে। হমরা লিয়ে তো ঔরৎ ঔরৎই হ্যায়, মজা করো ঔর দুর ফেকো। ইতনা রূপিয়া কমানেকা কিয়া ফায়দা বোলিয়ে।

আমি হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, 'আপকো বিবি বচ্চা হ্যায়?'

কেশরী মল সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বলল, 'হ্যায় সবকুছ, লেকিন সবকুছ রহতে হুয়ে ভি নাহি হ্যায়। তিনশ পয়ষট্ দিনমে

তিনশ রোজ বাহার রহনে হোতা হ্যায়। তিনশ রোজকে লিয়ে তো কুছ চাহিয়ে বাবু।' আমাদের দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলয়, 'লিজিয়ে বাবুজি সিগারেট পিজিয়ে।'

আমরা এক একটা সিগারেট ধরিয়ে টান লাগালাম। সিগারেট আমি খুব একটা খাই না কিন্তু ফ্রিতে পাওয়া দামী সিগারেট ছাড়বার মত বোকামী করার কোনই মানে হয় না।

কেশরী মল কথা বলছিল আমাদের সঙ্গে কিন্তু ওর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ ঐ কোলাহলমুখর জলাশয়ের দিকে। মেয়েগুলো স্নান করতে করতে ক্রমশঃ যেন আরও বে-আব্রু হয়ে পড়তে লাগল। আমার ভীষণ অস্বস্তিবোধ হোচ্ছিল।

কি অন্যায় কথা। মেয়েগুলো জানেও না যে তারা লোভী তিনটে পুরুষের চোখে কি লোভনীয় দৃশ্য সৃষ্টি করছে। তাদের অজান্তে তাদের দেহের রূপ যৌবন অপর পুরুষের চোখে কি নেশার রং লাগিয়েছে। আড়াল থেকে শুধু চোখের দৃষ্টিতে তাদের নিষিদ্ধ রূপ সুধা চুরি হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমি স্বভাব চোর নই তাই অমন চুরি করে বে-আব্রু যুবতির বেসামাল শরীরকে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। হঠাৎ আমি উঠে দাঁড়ালাম।

প্রসাদ আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, 'চল আমরা যাই'। কেশরী মল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল 'চলিয়ে গার্ডবাবু হম ভি চলেঙ্গে' এই বলেই সিগারেটের প্যাকেট মাটি থেকে তুলে নিল। তারপর আরেকটা জিনিষ একটু দূর থেকে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঐ জিনিষটা আমরা এতক্ষণে লক্ষ করলাম। বস্তুটা বাইনাকুলার। আমার সমস্ত শরীরটা ঘৃণায় রিরি করে উঠলো। কি জঘন্য চরিত্রের লোক। বনে বাদাড়ে সরলপ্রাণা গ্রাম্য যুবতিদের অসংবৃত দেহ সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য সে প্রস্তুত হয়েই ঘুরে বেড়ায়।

আমার বা প্রসাদের মত আচমকা চোখে পড়ে যাওয়া দৃশ্য নয়। ওর সম্পূর্ণ জানা ঘটনা।

লোকটার অনেক কথা বলছিল পথ চলতে চলতে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলতেও আমার প্রবৃত্তিতে বাধছিল। যদিও ভাবছিলাম যে ওর স্বভাব যেমন খুশী হোক আমাদের তাতে কি। আমরা এসেছি রেলের ডিউটিতে। আমাদের কাজ আমরা করব তাতে ওর বলার কিছু নেই।

জঙ্গলটা থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় কোয়ারীর ধারে আসতেই দেখি ড্রাইভার আর ফায়ার ম্যান আসছে। কাছে আসতেই ওরা বলল, 'গার্ডসাহেব আপলোক বক্সা রোড চলিয়ে গা তো? আপকা ব্রিকভ্যান কো লে চলে গা।

মনে পড়ল, তাইতো ছোটবাবু রবি রায়ের বাড়ী নেমন্তন্ন আছে। বাজার হাটগুলোও বয়ে আনতে হবে।

ব্রেকভ্যানটা টেনে নিয়ে ইঞ্জিন চলল বক্সা রোড। ব্রেকভ্যানে প্রসাদ, আমি, কিষাণ, ঠিকাদার কেশরী মল ও একজন কুলিসর্দ্দার। বক্সা রোডে যখন আমরা পৌছলাম তখন বেলা ঠিক বারোটা। ড্রাইভার বলল, 'বাবুজি তিন সাড়ে তিন বাজে আপলোগকে নিয়ে যাব।

সম্মতি জানিয়ে স্টেশন রুমের দিকে অগ্রসর হলাম। কেশরীমল তার কুলিসর্দ্দারকে নিয়ে কোথায় গেল কে জানে।

॥ আট ॥

দুই একদিন আরও কেটে গেল। একই রকম কার্য্যসূচী। এর মধ্যে আমরা এক বেলা জয়ন্তীতে যেয়ে ঘুরে এলাম। জয়ন্তী বেশ বড় জায়গা। কাঠের ব্যবসার বেশ বড় বড় আড়ৎ আছে। সবই প্রায় শাল কাঠের। শালগাছের নানা আকারের স্তূপ। জয়ন্তীতে আরও একটা ব্যবসা আছে। ওখান থেকে পাথুরে চুন চালান হয় প্রচুর পরিমাণে। স্থানীয় অধিবাসীই বেশী। বাইরের লোকও অনেক আছে ব্যবসা সূত্রে। ঘর বাড়ী, দোকান পসার, বাজারও আছে। মোটামুটি সবই পাওয়া যায় ওখানে। কেশরীমলের দুচারটে আড্ডা আছে ওখানে। ব্যবসায়ী ঠিকাদার মহলে কেশরী মলের বেশ খাতির।

জয়ন্তীতেও আছে পাথরের বড় বড় কোয়ারী। চারিপাশে পাহাড় আর পাহাড়। বন আর জঙ্গল। বক্সা রোডের সাথে তফাৎ শুধু এক জায়গায়। এখানে জনসংখ্যা অনেক বেশী, ফলে জীবন যাত্রা অনেক বেশী দ্রুতগতি। স্টেশনের কাছেই দেখলাম এক খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। তার উপর আছে মহাকালের মন্দির।

আমি আর প্রসাদ কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সেই পাহাড়ে ওঠার কোন রাস্তা খুঁজে পাইনি। অথচও বছরের কোন এক সময় খুব ধুম ধাম করে মহাকালের পূজা হয়। মস্ত মেলাও বসে জয়ন্তীতে মহাকালের পূজা উপলক্ষে। বেশ কিছু লোকও নাকি ঐ সময় মহাকালের দর্শনলাভ করে পুণ্য সঞ্চয় করে। খুবই কষ্টসাধ্য সে সঙ্কল্প।

জয়ন্তীতে একটা সুন্দর নদী আছে নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না আমি। যেখানে রেল লাইন শেষ হল তারই পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে খরস্রোতা, সুন্দরী স্রোতস্বিনী নিজের মনে

গান করতে করতে বয়ে যাচ্ছে। রেল কোয়ার্টারগুলোও ঠিক নদীর তীরেই।

সকাল বেলা পাথর বোঝাই দেখছি একমনে। ওটাই আমাদের প্রধান প্রোগ্রাম।

কিন্তু কাঁহাতক পাথর বোঝাই দেখে সময় কাটানো যায়। কাগজ পত্রের যা কাজ তা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

সেদিন সকালে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সূর্য্য তখনও খোলা জায়গায় মাথার উপর আসতে পারেনি। সমস্ত কোয়ারীতে কিন্তু স্বচ্ছ দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সেই চঞ্চলা উচ্ছলা পাহাড়ী ঝোরা আপন মনে গান গেয়ে লাফাতে লাফাতে চলেছে পাথর থেকে পাথরে।

আমি আর প্রসাদ একটা বড় পরিষ্কার পাথরের উপর পা ঝুলিয়ে বসে কুলিদের কাজ দেখছিলাম। বেশীর ভাগ পাথর বইছে মেয়েরা। ওদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে যুবতি সে একটা বড় বোল্ডার মাথায় তুলে নেওয়ার সময় একটা কুলি যেন তার কানে কানে কি বললো।

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর স্বচ্ছন্দে, সদম্ভ পদক্ষেপে মালগাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল। নিঃশব্দে আমাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। আমি আর প্রসাদ দুজনেই ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম।

খুব দ্রুত মেয়েটি আবার ফিরে গেল। আমাদের কাছাকাছি এসে আমাদের এক এক করে দেখে চোখ নামিয়ে নিয়ে মুখে এক অপূর্ব মদিরার হাঁসি মাখিয়ে আমাদের অতিক্রম করল। যাওয়ার সময় ওর গতি খুবই শ্লথ হয়ে গেল।

ও চলে যেতে আমি আর প্রসাদ দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে হেঁসে উঠলাম।

আমি বললাম, 'খুব চটকদার হে, চেহারাখানা দেখবার মত।' প্রসাদ সোৎসাহে উত্তর দিল, 'হাঁ আপাতত বনভূমিতে শ্রেষ্ঠতমা। ওর নাম লছমী।'

আবার লছমী আসছে। আমরা শক্ত হয়ে বসলাম। লছমীর আগে যে দু'টি মেয়ে পাথরের চাঁই মাথায় নিয়ে আসছিল তাদেরকে হারিয়ে দেবার জন্য লছমী প্রায় ছুটছে। মেয়ে দুটি বুঝতে পারেনি প্রথমে। যখন বুঝলো, ওরাও ছুটলো। তিনটি মেয়েই খুব অল্প সময়ের মধ্যে, স্বল্প ব্যবধানে আমাদের অতিক্রম করে গেল।

লছমী ওদের সঙ্গে পারেনি। ওরা তিনজনেই ফিরে আসছিল। তিনজনের মধ্যে ছোট খাট তর্ক হচ্ছে। আমাদের কাছাকাছি এলে শুনতে পেলাম লছমীর গলা।

লছমী বলছে, 'তুরা তো আগে ছিলি। চল না এক সাথে লিয়ে যাই, কে পহলে যাবি দেখব।'

উত্তরে অন্য মেয়ে দুটি কি বলল বুঝলাম না। আরও অনেকে পাথর নিয়ে যাচ্ছে। না না বয়সের লোক ও মেয়ে ছেলে।

কিন্তু আমরা নিঃশব্দে কেন্দ্রিভূত হয়েছিলাম লছমী ও তার সখীদের কার্য্যকলাপে। যতক্ষণ কাজ করছে ওরা ততক্ষনই উৎফুল্ল। পরিশ্রমের কোন ছায়া ওদের চোখে মুখে নেই। ওরা এত দরীদ্র কিন্তু একটুও দুঃখী মনে হয় না।

ওরা সারাদিন কাজ করে কয়েকটা খোলা ওয়াগন ভর্তি করেছে। আমরা মাঝখানে স্নান করে, গাছের ছায়ায় রাখা ঠাণ্ডা ব্রেকভ্যানের মধ্যে খাওয়া দাওয়া করে একটু জিড়িয়ে নিলাম। তার পর আবার গেলাম কাজের ওখানে।

কাজের কাছে চুপ করে বসে থাকাটা আমাদের কাছে ক্লান্তিকর বোধ হচ্ছিল না মোটেই। কারণ ঐ মনোরম পরিবেশ আর ঐ পরিবেশে সদ্য আবিষ্কৃত আমাদের লছমী সুন্দরীকে দেখে।

ঐ ভয়ঙ্কর বনে যখন থাকতেই হবে তখন ওদের নিয়ে ঐ কয়টা দিন সংস্কার মুক্ত হয়ে কাটিয়ে দেওয়াই ভাল। সত্যি কেশরীমল ঠিকই বলেছে।

চারটায় ওদের ছুটি হয়ে যায়। ওদের সঙ্গে আমাদেরও ছুটি। রাতের অন্ধকার হলেই চিন্তা। বন যত সুন্দরই হোক বন্য প্রাণীদের বাসস্থান। শুধু বাসস্থান নয় আহার সংগ্রহের উৎসও বটে। রাত্রি বেলাতেই বিশেষ ভাবে জেগে ওঠে ওদের রক্ত পিপাসা। সুতরাং একটু অসাবধান হলেই জীবনটা খোয়াতে হতে পারে।

রাত্রির প্রথমটা অবশ্য কিছুটা নিরাপদ। মালগাড়ীর ঢাকা ওয়াগন গুলোর দুপাশে জ্বলে কুলিদের তৈরী আগুনের ছোট ছোট কুণ্ড আর তার মধ্যে কুলিরা রান্না বান্না, চিৎকার, হৈ হল্লা করে আর করে তাদের দেশোয়ালী গান।

আমাদের সাহসটা আগের চেয়ে বেড়েছে। আমরা ঠিক সন্ধ্যের সময় ঢুকিনা ব্রেকভ্যানে। ঢুকলেও বারান্দাতেই কিছুক্ষণ বসে থাকি। কুলিদের গান শুনি।

সেদিন সন্ধ্যেটা ঠিক জমে ওঠার আগেই হঠাৎ কেশরীমল এসে উদয় হল আমাদের কামরায়। একয়দিনে সে একবারও আসেনি। আমরা যথারিতি আহ্বান জানালাম তাকে।

'কেমন লাগছে বাবু সাব'? কেশরীমল দাঁত বের করে প্রশ্ন করে।

উত্তর দিলাম, 'এখন পর্য্যন্ত খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছেনা' কেশরী মলের কাছে পরাজিত হতে রাজী নই আমি।

প্রসাদ প্রশ্ন করল, 'বোলিয়ে ঠিকাদারসাহাব, কিস লিয়ে আনা হুয়া-?'

বিনয়ে বিগলিত হয়ে ঠিকাদার উত্তর দিল, 'চুপ চাপ বৈঠা থা। সোঁচা কি থোরা আপলোক সে বাত চিৎ করেঁ।' একটু খানি চুপ করে থেকে বলল, 'হিঁয়া তো বহুৎ রোজ রহনে হোগা। দুচার রোজ বাদ মন নাহি লাগেগা।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি তো অনেক বার এসেছেন, তা আপনার তো আরও ভাল না লাগবার কথা।'

কেশরীমল ভাঙ্গা বাংলায় আমার কথার উত্তর দিল, সো হামার

ইন্তেজাম তো আছে। হামি তো বাহিরে বাহিরেই ঘুরতে আছি আমার ব্যেবস্থা তো হামাকেই রাখতে হোয়।'

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করি, 'আপনার ব্যবস্থা কি আলাদা কিছু আছে না কি?'

'আছে না?' ঠিকাদার কেশরীমলের চোখে বিস্ময়ের আভাস 'হামি তো আপনাদের মোতো নিরামিষ থাকে না বাবুজি।'

'নিরামিষ তো আমরাও থাকিনা। আজই তো কিষণ যেয়ে জয়ন্তি থেকে মাছ নিয়ে এনেছে। ওখানে তো মাংস ও পাওয়া যায় শুনেছি। আমরা, বাঙ্গালীরা নিরামিষ খেতেই পারিনা তা তো জানেন।' আমি একনাগাড়ে বলে গেলাম।

আমার কথা শেষ হতে কেশরীমল একটু বিজ্ঞের মত হেসে লল 'আরে বাবুজি হামি মাছ, মাস্ উসবের বাত বলসি না, উসকো াথ যো মাল থাকে, উসকো বারেমে বোলসি।'

'মাল?' প্রসাদ ও আমি উভয়েই একসঙ্গেই প্রশ্ন করি। 'সেটা াবার কি জিনিস?'

'সোটাই তো আসলি জিনিস। আপলোগ অভি বাচ্চা, আক্কেল া কচ্চা। সমঝলেন নাতো?' কেশরীমলের চোখে কুটিল দৃষ্টি। একটা ঢোঁক গিলে বলল, 'মালকে মতলব হোল শরাব যো বোতল ম রহতা হ্যায়।'

চমকে উঠলাম আমি কিন্তু কিছু বললাম না। প্রসাদ কিছু লতে যাচ্ছিল কিন্তু ওকে থামিয়ে দিয়ে পরম উৎসাহে বলতে লাগল কশরীমল—'হিয়া রহনেসে থোড়া থোড়া শরাব পিনে সুরু কিজিয়ে, দখিয়েগা তবিয়ত তুরুস্ত হো যায়গা।' শেষের দিকে ঠিকাদার চাস্ত হিন্দিতে বলে ফেলল।

প্রসাদ প্রশ্ন করল ওকে, 'হিয়া পর আপকো উ সব চিজ মিলতা ায় কেইসে?

ঠিকাদার আবার হাঁসলো, হেঁসে বলল, 'আরে বাবু সাহাব

কেশরীমল সব কুছ ইন্তেজাম পক্কা রাখতা। সব লায়া আলিপুরসে। আপনা পুরা ইস্টক্ সাথ মে লায়া। অগর খতম ভি কভি হো গয়া তো জয়ন্তীমে হমারা দোস্ত সব হ্যায়, উধার দু'চার বোতল মিলহি যাতা।'

ঠিকাদার কথা বলতে বলতে ইঞ্জিন লেগে গাড়ীটার সাণ্টিং হতে শুরু হল। সাণ্টিং শেষে খান চারেক পাথর বোঝাই গাড়ী টেনে নিয়ে ইঞ্জিনটা চলে গেল বক্সা রোডে। আমাদের গাড়ীগুলো প্রতি-দিনের মত কোয়ারী সাইডিং-এ পড়ে রইল। ইঞ্জিনটা চলে যেতেই হঠাৎ খেয়াল হল, আমাদের ব্রেকভ্যানটা একেবারে আলাদা হয়ে পড়ে আছে।

ঠিকাদার কেশরীমলই আবিষ্কার করল, 'আরে ইয়ে কেয়া, ইসকো এতনা দুরমে কাহে রাখ দিয়া ?'

আমাদেরও রাগ হল, সত্যি মূল ট্রেনটা থেকে অন্ততঃ এক'শ গজ দূরে আমাদের ব্রেকভ্যানটা। রাত্রিবেলা যদি কেউ এসে আমাদের মেরে রেখে যায়, হাজার চীৎকার করলেও মালগাড়ীর কুলিরা পর্যন্ত টের পাবে না। কিন্তু তখন কোনো উপায়ও নাই।

কেশরীমল আবার তার নিজের কথায় এল, 'সির্ফ শরাব'হি নাহি ঔর চিজ ভি হ্যায়—'

প্রসাদ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'এক তো হুয়া মাল, অভি ইয়ে ঔর চিজ কিয়া হায় ?

কেশরীমল হেসে বলল, 'আপলোক শরাব পিনেসে ও সব কুছ মালুম হো যায়গা। ইস জঙ্গল মে উহ সব চিজ আপকো জরুরত পড়েগা। তো বোলিয়ে বোতল ভেজ দেঁ যাকে ?' সোৎসাহে কেশরীমল আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। অন্ধকারে ওকে একটা ভূতের মত দেখাচ্ছিল।

প্রসাদ একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'নাহি ঠিকাদার সাহাব উ সব চিজ হামলোককে কোই জরুরত নাহি। হামলোক পিয়া নাহি কভি।

কেশরীমলের চোখ দুটো ঐ অন্ধকারেও জ্বলে উঠলো। 'তাজ্জব বাত হ্যায় গার্ড সাহেব, আপলোক গার্ডকে নোকরী করতে হেঁ ঔর আভিতক শরাব নাহি পিয়া। আরে হামারা পাসতো সব কয়েনকা মাল হ্যায়, ঔর উসকা বহুৎ অচ্ছে টেস্ (Taste) ভি হ্যায়। এক দফে পি লিজিয়েগা তো মালুম পড়েগা।'

আমি এবার বিরক্ত হয়ে বললাম, 'না ঠিকাদার সাহেব ও সব ব্যাপারে আমাদের কোন স্পৃহা নাই। আপনি আর ওরকম লোভ দেখাবেন না।'

ঠিকাদার কেশরীমল আপন মনেই বিড় বিড় করে বলল, 'আজিব বাত হ্যায়, শরাব কভি নাহি পিয়া। হামারা স্টোন ট্রেনমে কেতনা গার্ড ড্রাইভার লোক আয়া, লেকিন কোই ভি বিলাইতি শরাব পিয়ে বিনা নাহি ছোড়া। ইয়ে তো পহলি বার হায় কি আপ যেইসে মুনি মহাত্মা সে মোলাকাত হো গয়া।'

ঠিকাদারের কথায় আমি হেঁসে ফেল্লাম। ইতিমধ্যে কিষণ এসে কামরায় হেরিকেন লন্ঠন জ্বালল।

কেশরীমলের মন ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'আমরা মুনি—মহাত্মা নই ঠিকাদার সাহেব। তবে ওসব জিনিস আমাদের চলে না। যাক, শুনুন একটু চা খেয়ে যান।'

কেশরীমল চায়ের কথায় আরও ক্ষুব্ধ হল, বলল, 'ছোড়িয়ে বাবুজী চায় তো ময় সুবাহকো এক কাপ পিতেহেঁ, ঔর যাদা পিনেসে তবিয়ত খারাপ হো যায়গা।'

হঠাৎ যেন কি খেয়াল হল এই ভাবে বলল, 'আরে ববাপ, অন্ধেরা হো গয়া। আভি তো আপনা কম্পার্টমে যানা হোগা, ঔর দে'র করনা ঠিক নাহি হোগা। হম চলতেহেঁ, আজ তো আপকা বিরিক-ভ্যান বহুৎ দূরমে রাখ দিয়া। হোঁশিয়ারী সে রহিয়েগা।' এই কথা বলেই কেশরীমল গাড়ী থেকে নেমে হন হন করে ওর কম্পার্টমেন্ট-গুলোর দিকে অন্ধকারের মধ্যে দ্রুত হাঁটা দিল।

ও গেলে প্রসাদ বলল, 'ব্যাটা বড় দাগা পেয়েছে। পুরো দলটাকে কিনে নিতে না পারলে ওর ঠিক সুবিধা হয় না।'

দিনের বেলায় আনা মাংস, পোর্টার কিষণ গরম করল। সঙ্গে দিনের বেলার তৈরী হাতরুটি। আমাদের কথামত কিষণ দু'বেলার রান্নাটা এক বেলাতেই করে রাখত। রাত্রে ঐ অন্ধকারের মধ্যে রান্না করাও অসুবিধা। অবশ্য খাওয়াটা যদি দুবেলারটা এক বেলায় সারা যেত তা হলেও আমরা ঢের বেশী খুশী হ'তাম।

আগেই বলেছি আজ আমাদের ব্রেকভ্যানটা পুরো মালগাড়ী থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খানিকটা দূরে রাখা হয়েছিল। গাড়ীর সান্টিং করার সময় ড্রাইভার এই কীর্তি করে রেখেছে। দূর থেকে কুলিদের 'রাম ভজো ভাইয়া হো' ধ্বনি সম্মিলিত কণ্ঠে ভেসে আসছিল। ওরা প্রতিদিনের মত আগুনের কুণ্ডও তৈরী করেছিল। কিন্তু তাতে আমাদের কোন উপকার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

কিষণ বলল, 'গার্ডবাবু হামরা ভি আগ জ্বালাব বাহার ?

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাঠ কোথায় পাবি ?'

কিষণ উত্তর দিল, 'অগল বগলসে জুটা লেগা'।

প্রসাদ বলল, 'না না তার কোন দরকার নেই, এখন বেশ রাত্রি হয়ে গেছে, তোকে গাড়ী থেকে নামতে হবে না।'

সমাজবদ্ধ জীব মানুষ, সমাজ থেকে দূরে সরে গেলে যে কত দুর্বল হয়ে পড়ে সেই দিন রাত্রে সেটা প্রথম উপলব্ধি করলাম। ঐ কুলিরা আমার স্ট্যাটাসের লোক নয়। আমি ও প্রসাদ অন্য শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু ঐ গহন বনানীর ভয়ঙ্কর রূপ আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বলে দিল, তোমরা যে শ্রেণী সৃষ্টি করেছ তা নিরর্থক। আজ আমাদের আক্রমণের ভয়ে ভীত, তোমরা শুধুই মানুষ। বিচ্ছিন্নতা নয়, একতাই তোমাদের রক্ষা করতে পারে।

ঐ বিজন বনে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার [illegible]

বন্য প্রাণীর রক্তপিপাসা জেগে ওঠে না। তার সঙ্গে নাকি আরও সব অদ্ভুত বস্তুর সাড়া পাওয়া যায়।

এটা ট্রেনের কুলিদের বিশ্বাস, আমাদের পোর্টার কিষণের বিশ্বাস আর বিশ্বাস ঐ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত অশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত এবং শিক্ষিত মানুষের। এর মধ্যেই অনেকে আমাদের নানারকম অশরীরি প্রেতাত্মা সম্পর্কে পূর্বাহ্ণে আভাষ দিয়ে রেখেছিল।

যারা রেলে গার্ডের চাকরী করতে এসেছে তাদেরকে অলপ্রুফ হতে হয়. ভূতের কৌতূহলও মেটাতে হবে দরকার হলে কারণ ট্রেনে আমরাই রেলসরকারের একমাত্র ট্রেনিংপ্রাপ্ত দায়ীত্বশীল প্রতিনিধি।

কিন্তু যাই বলিনা কেন সেদিন কেন যেন গাটা ছম ছম করে উঠলো। নিজের জানা বহু ভূতের গল্পের নায়করা, কঙ্কালসার চেহারায় মিছিল করে যেন আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ একটা বিকটাকার গর্জন শুনতে পেলাম। বেশ খানিকটা দূরে। তারপর কিছুক্ষণ বিরতি। আবার সেই গর্জন। এবার প্রসাদ বলল, 'চল ব্রেকভ্যানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকি, এত সাহস করার কোন অর্থ হয় না।'

ত্ব'জনে ব্রেকভ্যান ঢুকে দুদিকের দরজা বেশ ভাল করে বন্ধ করে ফেললাম। ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি আটটা। খাওয়ার পর্বটা কোন-ক্রমে চুকিয়ে ফেললাম।

তারপর ঐ ঘরের মধ্যেই তিনজন শুয়ে পড়লাম।

শুয়ে আছি চুপচাপ।. ঘুমের চেষ্টা করছি কিন্তু ঘুম আর আসে না। দূরে কুলিদের হৈ-হুল্লোর ক্রমশঃ কমে এল। নিদ্রাহীন চোখে চুপচাপ শুয়ে থাকা যে কি কঠিন ব্যাপার তা বোঝানো যায় না।

রাত্রের বিভিষীকাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। আশে, পাশে নানা রকমের শব্দ। শহরের বিজলী পাখার তলায়, বিনিদ্র জংশন স্টেশনের সশব্দ রাত্রিকালীন যান্ত্রিক ব্যবস্থায় অভ্যস্ত আজকের

মানুষ সেই জয়ন্তী অঞ্চলের পাহাড়ঘেরা গভীর বনের মধ্যেকার অসাধারণ ভয়ভীতির কথা কল্পনাতেও আনতে পারবে না।

নিস্তব্ধ বনরাজ্যের সশব্দ রাত্রি। নাম না-জানা এক একটা আওয়াজ হয় আর বুকের ভেতরটা ভয়ে কেঁপে ওঠে। কে যেন হাতুড়ি দিয়ে মেরে বুকটা ভেঙ্গে দিতে চাইছে। বাইরে ছুটোপুটি হচ্ছে মাঝে মাঝেই। কে যেন মালগাড়ীর পাশেই চড়চড় আওয়াজ করে টেনে কি ছিঁড়ছে।

হঠাৎ আবার সেই পূর্বপরিচিত গর্জ্জন। তার পরেই কে যেন রাগে গরগর করছে টের পেলাম। আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে আছি। পাশে প্রসাদ। বুঝলাম প্রসাদও ঘুমোয় নি।

প্রশ্ন করলাম ফিস্ ফিস্ করে, 'প্রসাদ শুনতে পাচ্ছ?'

প্রসাদও প্রায় আমার মত ফিস্ ফিস্ করেই উত্তর দিল, 'পাচ্ছি না আবার, মহারাজ আনাগোনা করছে, চুপচাপ শুয়ে থাক যেন ঘুনাক্ষরেও আমাদের অস্তিত্ব টের না পায়।'

হঠাৎ ব্রেকভ্যানের ছাদের উপর কি একটা লাফিয়ে পড়ল। রাত্রি বেলায় সেই আওয়াজটা বাজ পড়ার মত শোনাল। একটা নয়, আবার একটা। শূন্য থেকে লাফিয়ে পড়েনি। ব্রেকভ্যানের মাথার উপর বড় বড় গাছের শাখা প্রশাখার বিস্তার। ঐ গাছের ডাল বেয়ে যে কেউই হোক আমাদের মাথার উপরে নেমে এসেছে।

এবার কারা যেন টিনের ছাদের উপর তাণ্ডব নৃত্য স্থরু করে দিল। ছুম দাম করে লাফাচ্ছে। তারপর হুড়দাড় করে দৌড়া দৌড়ি করছে। কে যেন মাথার উপরে গাছের ডালটাকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিতে লাগল। কোন শক্তিশালী প্রাণী না হলে ওভাবে কেউ গাছের ডাল নাড়াতে পারে না বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু ওরা কারা? ওরা অশরীরি না রক্তমাংসের শরীরধারী? নিজেকে কেমন যেন অসহায় বোধ হচ্ছে। ভয়; দুর্জ্জয় ভয়, সে ভয় অস্ত্রশূন্যতার ভয়। সে ভয় ভূতের ভয় কিনা জানিনা তবে প্রাণের

ভয় আমি জোর গলায় বলতে পারি। যত সাহসী লোকই হোক না কেন আমাদের অবস্থায় পড়লে তাদের দুর্জ্জয় সাহসও ভেঙ্গে পড়ত তাসের ঘরের মত।

ব্রেকভ্যানের মাথার উপরের শক্ত লোহার চাদরের উপর কারা যেন পরম উল্লাসে হুড়দাড় করে দৌড়োদৌড়ি শুরু করল। হঠাৎ একটা, ছাদের উপর থেকে পড়ল ব্রেকের বারান্দার উপর—

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর ঠিক গাড়ীর নিচে যেখানটায় অন্ধকার খুব গভীর। শুধুমাত্র কতকগুলো জোনাকী পিট পিট করছে, ঘন অন্ধকারকে খুবলে খুবলে ছোট ছোট ক্ষতর সৃষ্টি করছে সেখানে একটা ঝটাপট্ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে উঠল তীক্ষ্ণ এক আর্তনাদ। তারপর চাপা একটা গর্জন। আবার সেই বদরাগী জন্তুর গর্গর্ আওয়াজ তারপর আবার সব চুপ।

শুয়ে থাকতে পারলাম না। উঠলাম। প্রসাদও আমার দেখা-দেখি উঠে বসল। সাইডগ্লাসের ভিতর দিয়ে বাইরে দেখবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে কিছু বুঝতে পারলাম না তারপর দেখলাম যেখানে জোনাকীগুলো একটু ফাঁকা সেখানে ঠিক সমান দূরত্বে এক জোড়া জ্বলন্ত জোনাক। আকারে অনেক বড়, দুটো মার্বেল গুলির মত গোল আগুনের ফুলকি। সে দুটো উঠছে, নামছে।

এবার একটা কড়মড় শব্দ। সেই রূপকথার গল্পের রাক্ষসের মুড় মুড় করে হাড় চিবিয়ে খাওয়ার মত। আমাদের শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল ভয়ে। ওটা বাঘ। নিঃসন্দেহে ঐ বাঘ ওখানে ওৎ পেতে বসেছিল। হাউ মাউ খাঁও মনিষ্যির গন্ধ পাঁও। কোন সন্দেহ নেই যে সে আমা হেন মনিষ্যির গন্ধ পেয়ে ঐ ব্রেকভ্যানের পাশে অপেক্ষা করছিল।

আমাদের হাড় চিবিয়ে খাওয়ার আগেই ঐ অবোধ শিকার পেয়ে, ওকে দিয়েই তার ক্ষুধার উপসম ঘটাচ্ছে। ওই আমাদের রক্ষা

করল নিজের জীবন দিয়ে। নতুবা ক্ষুধার্ত্ত ঐ রাক্ষস নিশ্চই এই মালগাড়ীর ওপর হানা দিতে কুণ্ঠা বোধ করত না।

ইতিমধ্যে কিষণ আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চাপা গলায় বলল, 'বাপরে, বাবুজি শের বৈঠা হ্যায় হুঁয়া।' ভয়ে তার সারা দেহটা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল।

প্রসাদ ওকে চাপা ধমক দিল, 'কথা বলছ কেন, চুপ চাপ থাক।'

আমাদের চাঞ্চল্য বা অতি সাবধানী গলার আওয়াজেও বাঘ বাবাজীর মনে কোন সন্দেহ হয়ে থাকবে। খাওয়ার সময় ঝামেলা কেই বা পছন্দ করে। সুতরাং ব্যাঘ্র পুঙ্গব প্রথমে গর্‌গর্ আওয়াজ করে মাথা তুলল বুঝলাম কারণ আগুনের ফুলকি দুটো একটু উপরের দিকে উঠল। খানিকক্ষণ স্থীর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তারপর বিরাট এক হুঙ্কার ছেড়ে শিকার নিয়ে গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করল।

আমরা আবার আমাদের অনাড়ম্বর শয্যায় গা ঢেলে দিলাম। মনের উপর যে প্রচণ্ড ধকল গেল এতক্ষণ তাতে ঘুমটা অনেকটা চটে গেল। কিন্তু ক্লান্তিতে আমার সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। ফলে কোন একসময় নিদ্রাদেবীর কোলে ঢলে পড়েছি।

নয়

পরদিন আবার নিত্যকর্ম। পাথর বোঝাই করার কাজ। কুলি গাড়ীগুলোর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় এক হাড় জিরজিরে বুড়ি কাঁচা কয়লার উনুন নিয়ে ধোঁয়ায় বেসামাল। মালগাড়ীর দরজার কাছে একটা তিন চার মাস বয়সের শিশু জীর্ণ মলিন কাপড় চোপড়ের উপর শুয়ে হাত পা ছুঁড়ছে। মাঝে মাঝে হেঁসে উঠছে আপন মনে। ঢাকা মালগাড়ীর ওয়াগনগুলো এখন প্রায়ই ফাঁকা। সকলেই কাজে বেরিয়ে গেছে। চার পাঁচটা সাত আট বছর বয়স্ক ছেলেমেয়ে সাইডিং-এর পাশের গাছতলা থেকে শুকনো কাঠ কুটো কুড়িয়ে আনছে।

রাত্রিবেলা যেখানে হিংস্র বাঘ বসে নির্বিচারে প্রাণী হত্যা করে আহার পর্ব সমাধা করেছে, দিনের বেলা সেই জায়গা গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ মনোরম বলে মনে হচ্ছে। এখন সেখানে কোন ভয়ের চিহ্ন মাত্র নাই।

আমরা আবার সেই পূর্ব দিনের পাথরের চাতালটার উপর যেয়ে বসে পড়লাম। আজ দেখলাম আমাদের দেখে যুবতী মেয়েগুলো খুব উৎফুল্ল হয়েছে। সেই লছমী, ঐ নারীকুলের শ্রেষ্ঠতমা লছমী, আজ যেন অনেক বেশী সতেজ আর প্রাণবন্ত।

আমরা যেয়ে বসতেই দু' তিনটা মেয়ে কানাকানি করে হেঁসে উঠলো। তারপর আবার কাজে মন দিল।

লছমী আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর দুই হাত তুলে ও পাথরটা মাথার উপর ধরে আছে। ফলে পীবর বক্ষ আরও উদ্ধত, আরও স্পষ্ট। ও দাঁড়িয়ে পড়তেই আমাদের বুকের ভিতরটা কেমন ঢিপঢিপ করতে লাগল। আমি আড়ষ্ট।

লছমী মুখে হাঁসি ফুটিয়ে প্রশ্ন করল, 'হেই বাবুজী তু'রা এখ'নে বৈঠে কি দেখতেসিস্?'

ওর ভাঙ্গা বাংলা শুনে আমি হেসে ফেললাম, বললাম, 'তোকেই দেখছি।'

ও বলল, 'হামাকে দেখে তুর কৌন ফয়দা আছে, আমি তো কুলি ঔরৎ—ঔর তু লোক বাবুজি—

পেছন থেকে মেয়ে আসছিল আরেকটা। লছমীর চেয়ে বয়স একটু বেশীই হবে। লছমীর কথা শেষ হওয়ার আগেই এসে ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, 'আরে চল্ আভি জল্দি করকে, বাবু সে বাত করনে কা মৌকা বহুৎ মিলেগা।'

লছমী রেগে গেল, বলল, 'তু হামসে মোকাবিলা করতা, চল্‌তো কৌন আগে ভাগতা হ্যায়।'

ওরা দুজনে ঐ ভারী পাথর মাথায় নিয়ে ছুটতে লাগল। লছমী তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। তারপর ওর প্রতিযোগীকে বিদ্রূপ করে কি বলল, শুনতে পেলাম না।'

উত্তরে ঐ মেয়েটি কি বলতেই ওরা দুজনে আমাদের দিকে চেয়ে খিল'খল করে হেসে উঠলো।

আমার মনে হল লছমী নিঃসন্দেহে সুন্দরী। লছমী যে কোন যোগ্য যুবকের কাম্য। যদি তথাকথিত সভ্যতার মুখোশ না থাকত তা হলে লছমী মাথা উঁচু করে স্বয়ম্বরা হতে পারত। ও মহাভারতের মৎস্যগন্ধা। কিন্তু ওকে পদ্মগন্ধা করবার কোন ক্ষমতা না থাকায় মাছের মতই জলে ভেসে বেড়ায়। যদি মৎস্য শিকারীর বড়শীতে ধরা পড়ে ও কখনও তবে নির্ঘাৎ সে তাকে খেয়ে ফেলে কাঁটাটা বার করে ফেলে দেবে।

ওরা আমাদের সম্মুখে এসে দুজনে বসে পড়ল।

'বহুৎ থক্ গয়া বাবুজি থোড়া বৈঠনে দেও।'

প্রসাদ বলল, 'ঠিক হ্যায় বৈঠো, লেকিন সর্দার নারাজ হোগা।'

লছমী রেগে গিয়ে বলল, 'উসকো নারাজি সে মেয়ে কিয়া। হাম উসকো বিবি নাহি হ্যায়।'

ওর রাগ ঠাণ্ডা করার জন্য আমি প্রসঙ্গটা পাল্টে ফেলে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোর নাম কি?'

কাজ হোল। মৃদু হেসে আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'মেরা নাম লছমী হ্যায় বাবুজি, ওর ইসকো নাম চামেলী।'

দুপুরে কাজের পর আধ ঘণ্টা ওদের অবসর। আমি, প্রসাদ ঐ ঝোরাটার পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেছি হঠাৎ একটা নারী কণ্ঠের কাতর অনুনয় শুনতে পেলাম ঝোপের আড়ালে 'নাহি ঠিকাদার সাহেব মেরা হাত ছোড়িয়ে।'

আমার কৌতূহলী হয়ে একটু এগিয়ে যেতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হোল।

কেশরীমলের কবলে আমাদের নায়িকা লছমী।

ঠিকাদার এক হাত দিয়ে লছমীকে জড়িয়ে ধরে চাপা গলায় বলল, 'বহুৎ রুপিয়া মিলেগা তুমকো। তুম মেরা বাত মান যাও। ব্যাস, তুমহে পথর উঠানেকা জরুরত নাহি হোগা।

এক ঝটকায় লছমী ওর হাত ছাড়িয়ে নিল। তারপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'লছমী কৈ এ্যাইসে ওইসে ঔরং নাহি। উহ সাদী সুদা ঔরং হ্যায় ঔর'—বলে একটু থামল তারপর বলল, হামারা প্যাস ইজ্জৎ জানসে যাদা পেয়ারা হ্যায়।' বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে হন্ হন্ করে ওর সামনে থেকে চলে গেল।

আমাদের খুব আশ্চর্য্য লাগল, ওকে বাগে পেয়েও কেশরীমলের মত লোক কোনরকম বল প্রয়োগ করল না।

আমাদের বিশ্বাস ছিল কেশরীমল সবরকম কাজই করতে পারে। এদিকে সাধারণ একটা নিম্নশ্রেণীর কুলিরমণীর প্রতি আমাদের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠলো।

আমরা আস্তে আস্তে ওখান থেকে চলে এলাম অন্যদিকে, সেখানে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে আমরা বসে পড়লাম।

এতক্ষণ উভয়েই বাক্যহারা হয়েছিলাম।

প্রসাদই প্রথম নিরবতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করল, 'কি রকম বুঝলে?'

আমি গলাটা একটু পরিষ্কার করে বললাম, 'বুঝলাম ঠিকাদার কেশরীমল একটি ঘুঘু চরিত্রের লোক।'

প্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমার কিন্তু লছমীকেও খুব মহিয়সী বলে মনে হচ্ছে না ও মুখে যতই বড়াই করুক না কেন!

প্রসাদের কথায় সায় দিতে পারলাম না প্রতিবাদ করলাম। 'এ তুমি কি করে বলছ, আজকের যে ঘটনা নিজে চোখে দেখলে তার পরেও—,

প্রসাদ বাধা দিয়ে বলল, 'সেই জন্যেই তো বলছি খেলোয়াড় মেয়ে লছমী। খুব সহজে ধরা দিলে ওজন অনেক কমে যায়। মেয়েজাতটা এই সত্যটা খুব বুঝতে পারে ভাল। তাই ওদের এত ছলা কলা।'

আমি কিছুতেই মানতে চাইছিলাম না তাই তর্কের সুযোগ বিনষ্ট করে বললাম, 'বাদ দাও ওদের কথা, আমরা শালা গার্ডগিরি করতে এসেছি, আমাদের কি দরকার ঠিকাদার আর তার কামীন-এর চরিত্র বিশ্লেষণ করার।'

প্রসাদ বলল হেসে, 'কিছুই না লেট ইট বি এ গুড্ গেম' হঠাৎ আমাদের কথা বন্ধ হয়ে গেল বন-জঙ্গলের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল এক নারীমূর্তি। সে মূর্তি আমাদের আলোচিত লছমীর।

আমাদের সামনে দেখে ও হকচকিয়ে গেল এবং আমরাও কিছুক্ষণ পলকহারা হয়ে রইলাম।

সুমুখে লছমী, যুবতী লছমী, সিক্ত বসনা লছমী। সদ্য নদী থেকে স্নান সেরে, ভিজে কাপড় গায়ে লেপটে আসার পথে থমকে দাঁড়িয়েছে। অকস্মাৎ লজ্জা, ব্রীড়ায় বেপথুমতি সুন্দরীকে ঐ বনভূমিতে যেন আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার মতই দেখাচ্ছিল।

যে পথ দিয়ে সে গিয়েছিল সেখানে বসে আছে শ্বাপদ চরিত্রের কেশরীমল, দুর্জ্জয় লোভ সঙ্গে নিয়ে। তাই ফিরবার সময় সে অন্য পথে ত্রাস্তভয়ে ভীতা হরিণীর মত লঘু পদক্ষেপে গা ঢাকা দিয়ে ফিরছিল। কিন্তু পথের মাঝখানে অপর দুজন যুবা পুরুষকে দেখে তার মরাল গতি রুদ্ধ হয়েছে।

আমরা হিংস্র নখদন্তধারী শ্বাপদ কিনা সে বিষয়ে লছমী নিঃসন্দেহ নয়। তাই তার গতি রুদ্ধ। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমরাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর রূপচ্ছটাকে স্বাগত জানাচ্ছিলাম। আমাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে ওর অন্তর্বাসহীন জলসিক্ত স্বচ্ছ আবরণের আড়ালে, উজ্জ্বল বরতনুর সমস্ত রস যেন শোষণ করছিলাম।

লছমী একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ঐ ভিজে শাড়ি দিয়েই শাড়িটাকে এদিকে ওদিকে টেনে নিষ্ফল আব্রু রক্ষার চেষ্টা করল। তারপর আমাদের দিকে একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে আমাদের সম্মুখ দিয়ে মনোহারী গতিতে ধীর পদক্ষেপে চলে গেল। তার সে গতির বর্ণনা কালিদাসের চেয়ে ভালভাবে দিতে পারব না।

আমরা নিজেদের ঐ রকম শানিত দৃষ্টির জন্যে লজ্জিত হলাম। যাই হোক তবুও লছমী ভাবেনি যে আমরাও কেশরীমলের মত অশালীন, সেইটেই আমাদের সান্ত্বনা।

সময় যতই চলে যাচ্ছে ততই আমি আর প্রসাদ লছমীর ব্যাপারে খুব বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি।

প্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভাই কপালে দুঃখ আছে।'

আমি সহাস্যে প্রশ্ন করলাম, 'কার, তোমার না কেশরীমলের?'

প্রসাদ হেঁসে উত্তর দিল, 'না লছমীর অথবা তোমার'।

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, 'নিশ্চিন্ত থাকতে পার এ শর্মার ঘরে এখনও লছমীর চেয়ে সুন্দরী বউ আছে সুতরাং—।'

প্রসাদও মাথা নেড়ে বলল, 'কিন্তু ভাই প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে সর্ব্বত্র'।

দু'জনে কথাবার্তা বলতে বলতে পথ চলতে সুরু করলাম। তারপর আমরা আবার কোয়ার্টারীতে ফিরে এলাম। হঠাৎ দেখি কেশরীমল। 'বাবুজি আজ চলিয়ে এক সাথ খানা খাউঙ্গা।'

কেন জানিনা আজ ওকে তুচ্ছ করতে পারলাম না। তবুও আপত্তি জানালাম, 'আরে আমাদের খাওয়ার তৈরী হয়ে আছে ওগুলো নষ্ট হবে।'

'আরে বাবুজি উহ রাতকে খেয়ে লিবেন।'

অগত্যা আমরা স্নান করে কেশরীমলের কামরায় হাজির হলাম। এতদিন আমরা একবারও পদার্পণ করিনি ওর কামরায়।

খুব ভালই খাওয়া হল, মাছ, মাংস, একটা তরকারী, চাটনি। কেশরীমল জানে না যে আমরা তার লছমী জনিত ঘটনায় সাক্ষী। ও খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা বলছিল।

খাওয়া শেষ হতেই একজন খবর দিল, 'বাবুজি ইঞ্জিনীয়র সাহেব আয়া পাথরকো নাপি করেগা।' ভরা পেটে আমি, প্রসাদ ও কেশরীমল তিন জনেই নেমে এলাম।

একজন এসিস্ট্যাণ্ট আই-ও-ডব্লু, ওয়ার্ক মিস্ত্রি এবং আরও জনা চারেক খালাশী।

এ, আই, ও, ডব্লু, ভদ্রলোকটি বাঙ্গালী। আমরা এগিয়ে যেতেই বললেন, আপনারা গার্ড।

আমরা মাথা নাড়লাম। আলাপ হল ভদ্রলোকের নাম মনোজ ভৌমিক, বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ, মাঝারি চেহারা।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই বন-জঙ্গলে খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না?'

বললাম, 'হলেই বা উপায় কি বলুন। চাকরী করতে এলে কষ্ট তো হবেই ভৌমিকবাবু। উনি এবার কাজের কথায় এলেন, 'কতগুলো গাড়ী ভর্তি হয়েছে?'

প্রসাদ হিসাব করে বলল, 'প্রায় বিশ ট্রাক।'

'চলুন মেজারমেন্ট করে লেবেল দিয়ে যাই, আইয়ে ঠিকাদার সাহেব।'

গাড়ীগুলো একদম কানায় কানায় পূর্ণ নয়। বেশ খানিকটা করে বাকি রাখা হয়েছে।

ভৌমিকবাবু বললেন, 'একি করেছেন, এতখানি করে খালি কেন?' ঠিকাদার সাহেব যুক্তি দিল, একদম ভর্তি থাকলে রাস্তায় গাড়ীর ঝাঁকুনিতে কিছু কিছু বোল্ডার পড়ে যায় তাই ঐ ব্যবস্থা।

ভৌমিকবাবু এবার রাগ করে বললেন, 'বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন। ঠিক আছে 'ওঝা' যে পর্যন্ত পাথর বোঝাই হয়েছে সেই পর্যন্ত মাপ কর।'

ঠিকাদার কেশরীমল এবার বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল, 'তব মর যায়েঙ্গে হুজুর, এতনা তকলিফ বেকার হো যায়গা।'

ভৌমিকবাবু ভেঙ্গিয়ে উঠলেন, 'বেকার হো যায়গা তো হম কিয়া করেগা? যেতনা মাল রহেগা ওৎনাহি নাপি মিলেগা।'

মনোজ ভৌমিক একটা ট্রাকের উপর উঠে পড়লেন, সঙ্গে ফিতে হাতে তার দুজন সহকারী। অনেক কষ্টে বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে কেশরীমলও গাড়ীটার উপর উঠলো। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম প্রসাদ বাধা দিল।

প্রসাদ আমাকে এক পাশে টেনে নিয়ে নিচু গলায় বলল, 'কি পাগলামী করছ, ওটা ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার ওদেরকেই করতে দাও। আমাদের নাক গলাবার দরকার কি?

ট্রাকগুলোর পূর্ণ মাপ দিলে ঠিকাদারের পেমেন্ট অনেক বেড়ে যাবে। বহু টাকার তফাৎ। অথচ ট্রাক মেজারমেন্টের পুরো কাগজ-পত্র ট্রাক সহ আমাদেরই বহন করতে হবে। সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আমাদের।

প্রসাদকে সে কথা জানাতে প্রসাদ বলল, 'সব স্টোন ট্রেনেই একই কারচুপি। আমরা একটা জায়গায় আপত্তি জানিয়ে কি করব এর সঙ্গে উপর থেকে নিচ তলায় সর্বত্র লিঙ্ক আছে, মাঝখান থেকে কোন সুযোগে আমাদের প্যাঁচে ফেলে দেবে।'

নিরস্ত হলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখলাম কেশরীমল নেমে পড়লো গাড়ী থেকে। আর ইন্‌স্পেক্টর ভৌমিকবাবু একের পর এক মাপ নিতে লাগলেন গাড়ীর উপর না উঠেই। তবে আমার সাধারণ বুদ্ধিতে যা কুলোল তা হোল এই, ঠিকাদার এক্ষেত্রেও সফল হয়েছে। তার কথামত কাজও হচ্ছে। প্রতিটি ট্রাকের পূর্ণ মাপ করে নিচ্ছে ভৌমিকবাবু।

আমরা আর কথা বাড়ালাম না। কাজ শেষ হতে হতে বেলা প্রায় পড়ে আসছিল, সন্ধ্যে হয়ে গেলে বিপদ। গাড়ীগুলিতে চটপট লেবেল মেরে মনোজবাবু তার মটোর ট্রলিতে উঠে বসলেন। আমাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক্ করে বললেন, 'আমি গিতালদহে পোস্টেড আসুন না একদিন।' আমরা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। মটোর ট্রলি ভট্ ভট্ শব্দ করতে করতে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

সন্ধ্যেই হয়ে এল প্রায়। কুলিরা বহুক্ষণ ফিরে এসেছে যে যার ঘরে। সামনে আগুনের কুণ্ডগুলো ধুঁইয়ে উঠেছে। অনেকগুলো উনুন তখনও কাঁচা কয়লার ধোঁয়া ছাড়ছিল।

প্রসাদ হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, 'চল লছমীর সঙ্গে ভাল করে আলাপ করে আসি।'

আমি বললাম, 'তোমার মতলব কি বলত? ব্যাপারটা কি খুব শোভন হবে প্রসাদ?'

প্রসাদ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'তুমি একটা নিরেট মাদী ছাগল।'

'তুমি কি ভাবছ আমি লছমীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি? না ঠিকাদারের মত লছমীর দেহের কামনায় আকুল হয়ে পড়েছি?'

কিন্তু তা বলে এই অন্ধকারের মধ্যে ওর ওখানে যাওয়াটা মোটেই ভাল নয় প্রসাদ। তারপর রাত হলে সাপখোপের

ভয়তো—'প্রসাদ গাড়ী থেকে নেমে বলল, 'ভয় ভয় করেই তুমি মরলে, এই সন্ধ্যে রাত্রে সাপ বাঘ এসে তোমায় খেয়ে ফেলল আরকি—'

'তুমি আসবে তো এসো, নইলে আমি একাই চলাম'—এরপর না বলা চলে না কারণ প্রসাদকে একা ছেড়ে দিতে মন চায় না। বড় স্বার্থপরতা দেখান হয়।

রাস্তায় যেতে যেতে প্রসাদ বলল, 'অত্যন্ত রহস্যময়ী নারী এই লছমী। ওর ভেতর বিরাট কোন ইতিহাস লুকোন আছে।' আমার ধারণা ও ঠিক কুলি ক্লাশের মেয়েছেলে নয়।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

লছমী যে কামরাটায় থাকে সেটার পাশে যেয়ে আমরা কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম। ভিতরে দু'জনের চাপা অথচ উত্তেজিত বিতর্ক। একজন পুরুষ, অপরটি নারী। নারীকণ্ঠ নিঃসন্দেহে লছমীর; কিন্তু পুরুষটি কে সেটা একটু পরে বুঝলাম।

পুরুষটি বললে—'দেখ্ লছমী হাম যো কহতা, মান যাও। ঠিকাদার সাহাব বহুত দিলবালা আদমী হ্যায়। তুমহে রূপিয়া পর বৈঠাকে রাখেগা।' গলাটা চিনতে পারলাম এবার। কুলিসর্দারের কণ্ঠস্বর।

লছমী ঝাঁঝালো কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো। "নাহি, নাহি, কভি নাহি"—লছমীর কণ্ঠ কি অশ্রুভারাক্রান্ত? লছমী বলে চলেছে 'হাম সরকার কো নোকরানী, উনকো কাম জরুর করুঙ্গী, লেকিন ঠিকাদার সাহাব কো উস বাত নাহি মান সকতি।'

ভরা গলায় লছমী বলে, 'সর্দারজি মুঝে ঐসে রূপিয়াকা জরুরত নাহি যো পাপ কো রাস্তাসে কময়া যায়। এক রোজ মেরা ভি বহুৎসা রুপাইয়া থা, আজ মায় রাস্তেকো ভিখারী। দু'টুকরো কি লালচ সে ম্যয় মজদুরী করতি হুঁ। ইস মেহনতই মেরা লিয়ে সবকুছ হ্যায়—'

সর্দার আবার বোঝায় ওকে—'শুন লছমী, ম্যায় তো ঠিকাদার সাহাব কো সন্দেশ লেকে আয়া থা। মাননা ইয়া না মাননা তোমহারা মর্জি। লেকিন মানহি লেতা তো আচ্ছা হোতা।'

একটু থেমে সর্দার গলাটা পরিষ্কার করে বলল, 'ঠিক হ্যায় আচ্ছি তরহ্ সে সোঁচ লো। তুমহে দু' এক রোজ কো মৌকা দিয়া।'

তারপর লছমীর কান্নার শব্দ পেলাম। এই সময়ে ওর ঘরে ঢোকা ঠিক নয়। আমরা ফিরে এলাম।

প্রসাদ বলল, 'ঠিকাদারের সর্দারটা কেমন হারামী দেখলে। শালা পাক্কা শয়তান। আর লছমীর যেমন রূপ তেমনি তেজ। ওর এত তেজ টিকবে কিনা শেষ পর্যন্ত সেইটাই ভাবছি।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'ও তেজের কোনই মূল্য নেই। মেয়ে মানুষের মন একটু খোশামোদের উত্তাপ পেলেই মোমের মত গলে যাবে। আর তাও যদি না গলে, হাতুড়ীর ঘায়ে ঠুকে ঠুকে ভেঙ্গে দেওয়া যাবে। তোমার ঐ কথাই ঠিক, ওসব দর কষাকষির ব্যাপার। যারা ঠিকাদারের অধীনে চাকরী করবে তার কথা শুনে চলতেই অভ্যস্ত তারা। যারা মানবে না তাদের শেয়াল কুকুরের মত লাথি মেরে দূর করে দেবে। যার পেটে ভাত নেই সে আবার আব্রু রক্ষা করবে? আর করবেই বা কেন? এইতো ওর বয়স পয়সা রোজগার করার, আর এই সুযোগই তো ঠিকাদার নেবে। দরীদ্র স্বামীহারা রমণীর পেটের ভাত জোগাড় করে দেওয়ার ছুতায় তার সর্বস্ব অপহরণ করবে।'

আমার লেকচার শেষ হলে প্রসাদ বলল, 'কেশরীমল বেটা হিন্দি ছবির সাক্ষাৎ ভিলেন। কিন্তু দেখ একটা ব্যাপারে তোমার সহযোগীতা চাই। লছমী কে এবং কি এইটে আমি বার করবই। সে যে কতটা ধোয়া তুলসী পাতা সেটা দেখতে হবে।'

আমি কিন্তু রাজী হতে পারছিলাম না, বললাম, 'স্বাভাবিক! তুমি তো রেলের লোক। রেলের লোকের এই এক বিশেষত্ব, খালি

পরের কোথায় কোন্ গোপনীয়তা আছে সেই ব্যাপারে মাথা গলানো।'

প্রসাদ আমার উপহাস গায়ে মাখলো না, বলল, 'তুমি যতই ঠাট্টা কর এটা একটা চ্যালেঞ্জ। একটা নিঃসহায় দরীদ্র যুবতী একটা লম্পট অর্থ পিশাচের হাত থেকে তার আব্রু রক্ষা করতে পারে কিনা সেটা নিশ্চয়ই দেখা উচিত। দরকার হলে লছমীকে আমাদের সাহায্য করাও উচিত। আফটার অল উই আর লিটারেট।'

প্রসাদের কথার যুক্তিতে এতক্ষণে সায় দিলাম।

॥ দশ ॥

কোয়ার্য়ীতে পরের দিন সকাল। পাথর বোঝাইয়ের নির্বাক সাক্ষী আমরা সেই অচল অটল পাথরের আসনে বসে আছি। চেয়ে চেয়ে দেখছি, কেমন ফুলওয়ালীর মত পাথরের ফুল মাথায় করে নিয়ে চলেছে লছমী, চামেলী, লাজবন্তীর দল। ওরা নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, শরীরের রক্ত জল করে সভ্য জগতের জন্যে পাথর বয়ে আনছে।

ওরা নিজেদের ইজ্জৎ বিকিয়ে, নিজের জীবন বিকিয়ে আধুনিক সভ্যতার সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে; রেল, ব্রীজ, রাস্তা তৈরী করার সরঞ্জাম। কিন্তু ঐ পাহাড়ের কোলে ওরা যেন ছোট ছোট ঝরণার মত হেঁসে হেঁসে কাজ করে যাচ্ছিল, ওমনি সরলতায় ভরপুর, ওমনি সজীবতায় জীবন্ত।

লছমীকে দেখে কে বলবে যে হায়েনার লোভী দাঁত ওর জন্যে হন্যে হয়ে আছে। কে জানে, চম্পা, চামেলী বা লাজবন্তী, শর্মিলির ওরকম বিপদ আছে কিনা।

ওরা আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে নানান ঢং-এ দুলতে দুলতে, উড়তে উড়তে, নাচতে নাচতে রঙ্গীন প্রজাপতির মত।

হঠাৎ লছমী দাঁড়িয়ে পড়ল আমাদের সামনে, বলল, 'বাবুলোক এখানে তোদের কিছু খোয়া গেলো নাকি। তোরা রোজ এখানে বসিয়ে থাকিস কেনে?'

কালভি দেখলাম, আজভি দেখলাম, হামাকে কুছ সবাল করবি নাকি?' প্রসাদ খুব সপ্রতিভ মেয়েদের ব্যাপারে, বলল, 'কেন এখানে বসে তোকে আর তোর বন্ধুদের দেখি।'

'কি দেখিস বাবু, হামাদের কি আছে?' লছমী বলল।

প্রসাদ উত্তর দিল, 'তোর নামটা যেমন লছমী তোর চেহারাটাও তেমনি লছমীর মত খুব সুরৎ।'

আমি ওর সঙ্গে আরও যোগ দিলাম, 'আর তোর গলার স্বর লছমীর মতই মিঠা।' বল সত্যি কিনা ?

লছমী খিল খিল করে হেঁসে উঠলো, তারপর বলল, 'হামি সব সমঝলাম। তুলোক ভি ওহি মরদ আছিস।'

তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কাল সাঁঝকে টৈম তোরা হামার কামরার বগলে এসেছিলি কেনে বোল ? তোদের কি তমন্না ছিল, বোল বাবু—'

আমরা নিরুত্তর। ও কি করে জানলো ? ও তো সংঘাতিক মেয়ে।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'তোর কামরা কোন্‌টা আমরা কি জানি। আমরা তো সব কুলিদের কামরা পার হয়ে আমাদের কামরায় যাচ্ছিলাম।'

লছমী কোন উত্তর দিল না। ওর মাথায় পাথরের বিরাট বোঝাটা নিয়ে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। ও কোন উত্তর না দিয়ে বোঝাটা নিয়ে চলে গেল। তারপর গাড়ীতে পাথরটা ফেলে ফিরে এল আমাদের সামনে।

'সচ বোস তো বাবু, তোরা কাল হামার কামরার কাছে আসলি কিনা ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ আমরা এসেছিলাম।'

'হ্যাঁ, তব চামেলী সহি বাত বলল।' ওর যেন একটা কঠিন অঙ্ক মিলেছে এমন ভাবে লছমী বলল। তারপর মনক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'তোরা সব মরদ একহি কিসিম আছিস। ছনিয়ামে সব মরদকা একহি আদত।'

আমি ওর বাচালতায় ক্ষুব্ধ হলাম, 'কি বাজে কথা বলছিস, তুই কাকে কি বলছিস বুঝতে পারছিস ?'

মাথা দুলিয়ে ছোট্ট মেয়ের মত বলল, 'বরাবর বুঝছি বাবু। ঔরৎ দেখনেসে তোরা সব মরদ ইতনা ছটফট করিস কি হামিলোকের বহুত ডর লাগে।'

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বললাম, 'তুই ভুল করছিস লছমী, তুই কিছুই বুঝিস না।'

'বাবুজি লছমীর আঁখ ধোঁকা খায় না। তুলোক শরীফ আদমী আছিস না বাবু?' বলে লছমী ঠোঁটের কোণে হাঁসির ঝিলিক দিয়ে আমাদের মাত করে চলে গেল। ওদের সঙ্গে আর তখন কথা বলার কোন স্পৃহা ছিল না। ওরা কাজ করতে থাকলো, আমি আর প্রসাদ এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সময় কাটাতে লাগলাম।

বেলা তিনটে নাগাদ কেশরীমল এল তার কাজের তদারকি করতে। ওকে দেখতে পেয়ে দেখলাম লছমী খুব গম্ভীর হয়ে পড়েছে। সচরাচর ও কোয়ারীর মাঝখানে আসতো না। সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে নানা রকমের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

ওকে দেখে আমি বললাম, 'প্রসাদ তোমার হিন্দি ছবির ভিলেনের আবির্ভাব হয়েছে রঙ্গমঞ্চে। এক হাত লড়িয়ে দেব নাকি তোমাদের।'

প্রসাদ বলল, 'আর লড়িয়ে দিতে হবে না, দেখ এমনি লড়ে যায় কিনা।'

চারটের সময় যখন কাজ শেষ হল তখন আকাশটা হঠাৎ কালো মেঘে ঢাকা পড়েছে। আমরা দুজন, সকলের শেষে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলাম। কিন্তু বৃষ্টি এসে পড়ল একটু তাড়াতাড়ি।

আমরা ছুটতে আরম্ভ করলাম। কুলি কামরাগুলোতে তাড়াহুড়া পড়ে গেছে। চেঁচামেচি হৈ হট্টগোল পড়ে গেছে।

লছমীদের কামরার সামনে এসে পড়তেই লছমী চেঁচিয়ে উঠলো, 'গার্ড বাবুলোক জলদি কর। হামারা ভাববাতে চলিয়ে আয় বাবুজি। বহুৎ জোর বারিষ আছে, জলদি ছুটনেবালা নাই।'

সত্যি সত্যি এত জোরে বৃষ্টি এসে পড়ল আমরা উপায়ান্তর না পেয়ে উঠে পড়লাম লছমীর কামরায়। ঠিক অনিচ্ছা সত্ত্বে বললে ভুল হবে তবে ইচ্ছে করেও ঢুকিনি ওর কামরায়। ভাবনা চিন্তা করার কোন সুযোগ পেলাম না, বিপদের একটা আশ্রয় পেলাম সেইটাই আমাদের কাছে তখন বড় কথা।

গাড়ীর মধ্যে এক কোণে একটা দড়ির খাটিয়া পাতা আছে। অল্প স্বল্প শাড়ী জামা, অধিকাংশই জীর্ণ ও ময়লা, একটা দড়ির উপর টাঙ্গানো। কিছু বাসন কোশন এক পাশে ছড়ানো। ঘরটা ঐ স্বল্প অবকাশেও মোটা মুটি গুছোন।

লছমী এই অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে যতদূর সম্ভব পরিপাটি করেছে। আমরা ঘরে ঢুকতেই লছমী দড়ির খাটিয়াটা টেনে দিল দরজার কাছে। আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'কোথায় আর বসবি বাবু, তোরা আমীর আদমী আছিস, এইখানেই বোস্।'

ভেতরটা বেশ অন্ধকার। কোনো জানলা নেই মালগাড়ীর ওয়াগনের। তার মধ্যেই লছমী ওর একরাশ কালো চুল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। একমনে চুল বাঁধছে আর আমাদের দিকে আড় চোখে দেখছে মাঝে মাঝে।

আমরাও চেয়ে আছি নিষ্পলক দৃষ্টিতে ওর দিকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর সুন্দর দেহলতার সবটুকু সৌন্দর্য্য আমরা দুজনেই পান করছি।

লছমী হঠাৎ ফিক্ করে হেঁসে ফেলল, তারপর বলল, 'বাবুজী হামার দিকে কি দেখছিস তোরা?'

'না না লছমী, তোমার দিকে চেয়ে ভাবছি তুমি কত ভাল, এই বৃষ্টিতে আশ্রয় না দিলে ভিজে মরতাম।' আমি আমতা আমতা করে উত্তর দিলাম।

উপহাস করে কিনা বুঝতে পারলাম না, লছমী বলল, 'আর যদি বৃষ্টি আজ নাই ছাড়ে?'

প্রসাদ উত্তর দিল এবার, 'তবে ভিজতে ভিজতেই চলে যেতে হবে।'

লছমী মাথার খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'কেনে বাবু, দুইজনায় হামার খাটিয়াতে শুয়ে রাতটা কাটাতে পারিবি না?'

উত্তর দেওয়ার আগেই একটা বিদ্যুতের ঝলকানিতে সারা কামরা মুহূর্তের জন্যে ঝলসে উঠলো, তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল।

আমাদের মুখের কথা আর বলা হল না। বরং লছমী আরও প্রগল্‌ভা হয়ে উঠলো, আপন মনে বলতে লাগল, 'বারিষ যদি না ছুটে তো হামার যে রুটি আছে ভাগ করিয়ে খাবি আর রাতে হামার ঘরে মৌজ করিয়ে শুবি, হামার সঙ্গে বাতচিত করবি। সুবা হলে তোরা চলিয়ে যাবি।'

কথার শেষে লছমী ঐ অন্ধকারের মধ্যে কপালে টিপ পরল। একেই বলে মেয়েমানুষ। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ঐ প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যেও নারীসুলভ স্বভাবের বশবর্তী হয়ে প্রসাধনীতে সামান্য ক্লান্তি নেই বরং আরও সজিবতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অথচ আমরা ওর তুলনায় কিছুই পরিশ্রম করিনি তবুও মনে হচ্ছে সারা শরীরে অসহ্য অবসাদ। কিন্তু লছমীর সংস্পর্শে এসে আমরা সেই অবসাদ আর ক্লান্তি ক্ষণিকের জন্যেও টের পেলাম না।

বাইরে তখন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। মালগাড়ীর টিনের চালের উপর সশব্দে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো পড়ছে. মনে হচ্ছে যেন লোহার ছাদটাকে ঝাঁঝরা করে দেবে।

লছমী বলল, 'বাবুজি বোস্ বাত্তিটা জ্বালিয়ে দি। আন্ধেরা তে তোদের মু দেখতে লারছি।'—বলেই আবার হেঁসে ও আলো জ্বালাতে গেল।

লছমী যে শ্রেণীর মেয়ে তার সঙ্গে আমাদের কোন কালেই মিলতে পারে না। অশিক্ষিত, গ্রাম্য, কোন নিচুজাতের মেয়ে আর আমরা লেখাপড়া জানা, কোট প্যান্টপরা, চাকরী করা ভদ্রলোকের ছেলে। লছমী বা আমরা কেউই কোন দিক দিয়ে পরস্পরের কাম্য হতে

পারি না। কিন্তু তবুও লছমীর কথা আমাদের মনের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল কেন?

একথার সঠিক উত্তর জানা নেই। তবে মনে হয় ওর দুর্ব্বার যৌবন, অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্য আর সাবলিল সপ্রতীভ ব্যবহার। এইগুলি বিশেষ করে ঐ কোয়ারীতে আসা সমস্ত পুরুষকে আকর্ষণ করেছিল।

আমরা অকস্মাৎ ভাবতে সুরু করেছিলাম এই সমাজের আচরণ কত অদ্ভুত। কিসের ভেদাভেদ, কিসের শ্রেণী আর জাত? আমরা সকলেই অমৃতস্য পুত্রা, আমরা মানুষ। আমাদের ঐ চিন্তা ভাবনার মূলে নিঃসন্দেহে লছমীর চরিত্রের কৃতিত্বই সবটুকু।

আলো অর্থাৎ কেরোসিনের একটা কুপি। গ্যাসের ধোঁয়ায় কামরার ভেতরটা বিশ্রি কটু গন্ধে ভরে গেল। কুপিটা হাতে নিয়ে এসে আমাদের পায়ের কাছে রেখে লছমীও ঐ স্যাংসেতে মেঝের উপর ধপ্ করে আমাদের পায়ের নিচে বসে পড়ল।

লছমী এবার বলল, 'বাবু থোড়া বাতচিৎ করনা, কুছভি বোল।'

—বললাম, 'কি আর বলব বল।'

লছমী আরও কাছে এগিয়ে এসে ওর অনিন্দসুন্দর মুখখানা তুলে ধরে বলল, 'মিঠা বাত কুছ বোল, তোরা তো মরদ আছিস্, যবান লড়কিকে কত বাত বলিস্, আমীর আদমী আছিস তোরা, বোলনা দু'চারগো পেয়ার মুহব্বতের বাত। হামার দিলকে আগ ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে।'

লছমী বলল বটে কিন্তু ওর চোখে মুখে যে দৃষ্টি দেখলাম তা কিন্তু করুণ, তার মধ্যে চাপা কান্না লুকিয়ে আছে।

প্রসাদ ওর বিষাদের সুর চাপা দেওয়ার জন্য বলল, 'লছমী পেয়ার মুহব্বত ছাড়া আর কোন বাত আমরা করতে পারিনা একথা ভাবছিস কেন।'

লছমী বলল, 'হামি ভাবি নাই বাবু, তোরাই ভাবিয়েছিস। বহুৎ

মরদ তো দেখলাম হামি, সব একই রঙ্গ একই ঢং। হামার সঙ্গে একেলামে একহি বাত বোলে। 'লছমী' তু বড়া খুপ সুরৎ আছিস হামার পাশে আর তোকে বহুৎ রুপিয়া দিব, তোকে রাণী বনাব।'

আমার খুব রাগ হল ওর কথা শুনে। মেয়েটাকে ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না। প্রসাদের কথাই কি ঠিক—খেলোয়াড় মেয়ে আমাদের ল্যাজে খেলাচ্ছে। বলে ফেল্লাম, 'ও সেইজন্যেই বুঝি তুই ঠিকাদার সাহেবকে এখন পাগল করে তুলেছিস?'

লছমী খিল খিল করে হেঁসে উঠল। 'ঠিক বুঝেছিস বাবু তুই, ঠিকাদার সাহেবকে খেলাছি ঔর তুদের দুজনাকেও। সবকে হামি আজমাব।'

বৃষ্টি থামবার কোন লক্ষণই নেই বরং আরও জোরে জোরে পড়তে থাকল। একটা কোণের দিকে ওয়াগনের ছাদের ফুটো দিয়ে জল পড়ছে ঝর ঝর করে। হঠাৎ ওখানে একটা বাচ্চা ছেলে কেঁদে উঠলো।

আমরা চমকে উঠলাম, লছমীও উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এগিয়ে যেয়ে একটা বছর দুই বয়সের বাচ্চাকে সযত্নে কোলে তুলে নিল। ওর কাঁথাটা ভিজে সপ্ সপ্ করছে।

ভিজে কাঁথাটা কামরার কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কতকগুলো শুকনো কাপড় চোপড় দিয়ে জড়িয়ে একপাশে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

বাইরের বৃষ্টির ছাঁটে ঘরের ভিতরটা ধুয়ে যাচ্ছিল।

প্রসাদ আর আমি উঠে একদিকের দরজা দুটো টানাটানি করে বন্ধ করে দিলাম।

ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে লছমী উঠে এল আমাদের কাছে।

প্রসাদ আস্তে করে প্রশ্ন করল, 'লছমী বাচ্চাটা তোর?'

লছমী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ বাবু হামরা অপনা পেটের ছেলে।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'ছেলের বাবা নেই ?'

উত্তরে বুকভরা আরেকটা নিশ্বাস ফেলল। ওর স্ফীত বুক হাপরের মত ফুলে উঠলো মুহূর্তের জন্যে তারপর চুপসে গেল।

লছমীর চোখ জলে ভরে উঠে। এই প্রথম জল দেখলাম লছমীর চোখে। চোখ দুটো ধীরে ধীরে মুছে আকাশের দিকে হাতটা তুললো, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ঐ ছেলিয়াটা বাবু হামার দুষমন আছে। উয়ার জন্যে মরতেও পারি না। উ যদি না থাকতো তো হামার একঠো পেটের জন্যে কোই চিন্তা ছিল না। আর হামি দেখতাম ঐ গীদ্দর (শেয়াল) লোক হামার কি করতে পারে।'

লছমী চুপ করল, আমরাও কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকলাম, কোন কথা নেই যেন কারুর মুখে। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ নিরব থাকা যায়।

প্রশ্ন করলাম, 'তোর দেশ কোথায়, তোর স্বামীর নাম কি ছিল, কি কাজকর্ম করত আমাদের বলবি ?'

লছমীর মুখে নিস্পৃহ ভাব। আমার চোখের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে নিরাসক্ত ভাবে বলল, 'শুনিয়ে কি করবি বাবু। হামার ভি দেশঘর ছিল, মরদ ভি ছিল বাবু।' একটু চুপ করে থেকে বলল, 'রহনে দে বাবু, ছোড় উসব বাত। হামার বদনসীব কহানী শুনে তোদের কাম নাই। তবে একটা বাত শুন বাবু কোই, জানে না। হামার হালৎ এত খারাপ ছিল না। হামার বাবুর সাত ভৈসা ছিল, জমীন ছিল ঔর অপনা মকান ভি ছিল। হামি ছিলাম হামার বাবুর লাডলি বেটি।'

এই পর্য্যন্ত বলেই ও চুপ করে গেল। আঁচলের একটা কোণ দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলল।

প্রসাদ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তুই তো সারাদিন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকিস, তোর ছেলেটাকে কে রাখে ?'

লছমী একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে, 'সরদারকে ঘরে এক বুড়িয়া

আছে। হামরা উকে নানি বলি। বহুৎ আচ্ছা আছে বুড়িয়াটা। উ না থাকলে তো পেট ভি হমার ভরতো না। লেড়কাটার হমার বুখার হল তিনদিন, ওর দবাইভি কহাঁ মিলবে, ডাগডারের বাত ছড়িয়ে দিলাম। ভগবানকে নাম পর উকে রাখে দিলাম।'

লছমীকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা তোর ছেলেকে কাল আমি দাবাই দিয়ে দেব। তোর ছেলে সেরে উঠবে।' সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোট বাক্স ছিল। আমার গার্ডবাক্সে সব সময়ই রাখতাম।

লছমীর মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ওর সমস্ত কষ্ট যেন এক মুহূর্তেই লোপ পেল। খুশীতে ডগমগ হয়ে বলল, 'সচ্ বাবুজি। সচ্ বোলছিস্, হামার লেড়কাকে তুই দবাই দিবি? হামার লেড়কা বাঁচবে?' ও আমাদের দুজনের পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম, বললাম, 'পা ছাড়। তুই কিছু ভাবিস না, আমি তো বললাম ওকে ওষুধ দিয়ে দেব?'

লছমী বলল, 'বাবুজি বারিষ থামলে পরে হামি যাব তোর কামরায়, আজই রাতে তুই দাবাই দে বাবু, তোর বহুৎ মেহেরবাণী হবে।'

আমি একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, কোনক্রমে পা ছাড়িয়ে নিলাম তারপর কথা দিয়ে ফেললাম, 'তোর যেতে হবে না এই রাতের বেলা, আমিই তোকে ওষুধ দিয়ে যাব।'

লছমীর গলায় একটা সুতো বাঁধা লকেট। সোনার না কিসের ঈশ্বর জানেন। একে অন্ধকার তায় লকেটটা এতই মলিন যে ওর রংটাও বিবর্ণ হয়ে গেছে।

প্রসাদ হঠাৎ প্রশ্ন করে ফেলল, 'লছমী তোর গলায় ওটা কি?' লছমী লকেটটায় হাত দিয়ে মাথায় ঠেকাল, তারপর অস্ফুট গলায় বলল, 'হামার পতির নিশানী আছে। ইসকে অন্দর উসকো এক বহুৎ ছোটা তসবীর আছে।' একটু থেকে বলল, 'হমার বাচ্চা যব বড়া হবে তো ওর বাবুজিকে চিনিয়ে দিব।'

বৃষ্টি ধরে এসেছে। ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি প্রায় আটটা। লছমীর লকেটটা সোনা কিংবা লোহা দিয়ে তৈরী বোঝায় কোন প্রয়োজন নেই ওটা লছমীর কাছে অমূল্য।

বৃষ্টি ধরে গেছে, এখন না গেলে আবার ঝেঁপে বৃষ্টি আসতে পারে। নেমে পড়তেই লছমী আবার মনে করিয়ে দিল ওর ছেলের ওষুধের কথা।

আমরা একরকম দৌড়েই আমাদের কামরার দিকে ছুটলাম। এই মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার দরুন রেললাইনের দুপাশে পথে জল দাঁড়িয়ে গেছে। আমাদের পা সেই জলে ঢাকা ঘাসগুলোর উপর পড়ছে আর ছপ্ ছপ্ করে আওয়াজ হচ্ছে।

এসে দেখি এর মধ্যে আমাদের সুযোগ্য সহযোগী কিষণ রাতের খাবার তৈরী করে বসে আছে। আমি তাড়াতাড়ি হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসার ছোট বাক্সটা খুলে তিন পুরিয়া ওষুধ তৈরী করে ফেললাম।

এখন এতটা পথ যাওয়ার কথা চিন্তা করতেই ভয় হল। আসার সময় আমি বা প্রসাদ কেউই অতটা চিন্তা করিনি। মুখ বের করে দেখলাম আজকে বাইরে কেউ আগুনও জ্বালেনি। জ্বলবেও না। কারণ সর্ব্বত্র জল এবং কাঠকুটোও ভিজে। কুলিদের কামরাগুলোতে অন্যদিনের মত গানের আসরও জমে ওঠেনি, কারণ অসময়ে বৃষ্টি।

বন্য প্রাণীদের শিকার করার এইতো মহা সুযোগ। শিকার যখন নিজেকে নিয়ে বিব্রত অবস্থায় থাকে তখনই তো তাকে ঘায়েল করার চমৎকার সময়।

তবুও কথা যখন দিয়েছি তখন লছমীর ছেলেকে ওষুধ দিয়ে আসাই উচিত।

গাড়ী থেকে নামতে যাচ্ছি প্রসাদ বাধা দিল, 'ওকি একা কোথায় যাচ্ছ? পাগল হয়ে গেলে নাকি? বাঘ মহোদয়ের কথা একেবারেই মনে নেই দেখছি। দাঁড়াও আমি যাচ্ছি।'

আমি সঙ্কুচিত হয়ে বললাম, 'এই জল বৃষ্টির মধ্যে আমরা এই এলাম। আবার তোমাকে—।'

প্রসাদ বাধা দিয়ে বলল, 'বুঝেছি একা একান্তে হিরো হতে চলেছ, উঁ হু সেটি হবে না। আমি জিরো হতে রাজী নই।'

ওর গার্ড বাক্স খুলে লাল, সবুজ ঝাণ্ডির ডাঁট দুটো বের করে নিল তারপর ও দুটোতে বেশ পুরু করে ছেড়া চট, ন্যাকড়া জড়িয়ে মাথার দিকগুলো মোটা গদার মত করে একটা আমার হাতে দিয়ে নিজের হাতে একটা নিল। এবার ওর নির্দ্দেশ মত দেশলাই দিয়ে জ্বালিয়ে নিলাম আমরা।

আমাদের তৈরী ঐ জলন্ত মশাল হাতে নিয়েও আমরা ছুটতে ছুটতে যেয়ে লছমীর কামরায় হাজির হলাম। লছমীর পাশের ঘরে একটা বিভৎস হট্টগোল।

একটি পুরুষকণ্ঠ খুব তড়পাচ্ছে। হিন্দি ভাষায় তার কণ্ঠে যে ভাষা নির্গত হচ্ছে তা শুনলে ভদ্রলোকের কানে আঙ্গুল দিতে হয়। আর একটা নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। তা মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ স্বরে ধ্বনিত হচ্ছে।

বুঝলাম ঐ ঘরে একটা প্রহার পর্ব্বের নাটক চলছে। লছমীকে ঔষুধটা দিয়েই আমরা পাশের কামরায় এসে হাজির হলাম। আমাদের অনুমান হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট কারেক্ট। মাঝবয়সী এক কুলি এই দুর্যোগের দিনেও কি করে হাঁড়িয়া গিলেছে। কোথায় পেয়েছে তা ঐ জানে। সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরের সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠেছে। এবং অধিকাংশ এই শ্রেণীর মাতালদের আদর্শ অনুসরণ করে সারাদিনের কর্মক্লান্ত বৌটাকে বেদম ঠেঙ্গাচ্ছে।

আমরা হঠাৎ ওখানে আবির্ভূত হতেই স্ত্রীলোকটি অনেক সাহস পেল। ওর ক্রন্দনধ্বনী আরও বেড়ে উঠলো তিনগুন।

'বাবুজি জানসে হামাকো মারডালা।'

ওর স্বামী নামধারী লোকটা আমাদের দেখে একটু সংযত হল।

কিন্তু তেজ একটুও কমল না। মদের ঝোঁকেই কপালে হাত ঠেকিয়ে একটা সেলাম ঠুকলো তারপর অনেকটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে বলল, 'ইয়ে মৌগী বহুত বেতমীজ হ্যায়। উসকো বেসাহারা দেখকে শাদী কিয়াথা মগর হ্যায় উ বহুৎ বেইমান।'

এবার বৌ-এর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে গর্জ্জে উঠলো, 'হমারা দৌলত খায়েগা তো হমারা বাত মাননা পড়েগা, যব বৈঠনে বোলেগা বৈঠেগি যব উঠনে বোলেগা উঠেগি, বলে আমাদের দিকে চেয়ে বলল, 'হ্যায় কি নেহি বাবু, আপহি বোলিয়ে? সহি বাত হ্যায় কি নাই?'

মেয়েছেলেটি পড়ে পড়ে কাঁদতে থাকে।

আমি লোকটাকে ধমক দিলাম, 'জনানা আদমী পর কাহে হাত উঠাতা হ্যায়।'

লোকটি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বলে, 'বাবু ইয়ে তো হমরা জনানা হ্যায় দুসরে কো ঔরৎ ত হ্যায় নাহি।'

এবার আমার অবাক হওয়ার পালা। অবাক হতে গিয়ে ওর কথায় হেঁসে ফেললাম, মাতালের মুখ দিয়ে অত্যাচারের যে সহজ অধিকারের ও সরল বিশ্বাসের কথা শুনলাম তা আমাদের দেশের দরীদ্র অসহায় মানুষেরই দীর্ঘশ্বাসের কথা। কি চমৎকার যুক্তি ওর নিজের জনানাকে মারছে। আসবাবপত্রের মতই ওর জনানাকে যা খুশী করবার অধিকার ওর আছে।

প্রসাদ ওকে বলল, 'দেখ' ঔরৎ কো ডাঁট লেকিন মারপিট করেগা তো ঠিকাদার কো বোলকে তুমহে নৌকরীসে নিকাল দেগা।'

এই কথায় কাজ হল। আমরা মালগাড়ীর নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। লোকটা হঠাৎ গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে দড়াম্ করে একটা আছাড় খেল। তারপর ঐ অবস্থা সামলে নিয়ে প্রসাদের পায়ের উপর আছড়ে পড়ল আর একবার।

'নাহি বাবু, এ্যাইস্যা মৎ কিজিয়ে। হুজুর মাই বাপ, লেড়কা বাচ্চা লেকে ভূখাহি মর্ যায়গা।'

'ঠিক হ্যায়, আব যাও।' প্রসাদ ও আমি আর মাতালের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় না করে হন্ হন্ করে ছুটলাম আমাদের ব্রেকভ্যানে। যাওয়ার সময় দেখলাম লছমী সযত্নে ওর ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করছে।

এগার

পুরাদমে কাজ চলছে। স্টোন ট্রেনের পাথর ভর্ত্তির শেষ পর্যায়ের কাজ। সকলেই কাজ শেষ করে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে উন্মুখ।

ঠিকাদার সাহেব হাঁসিমুখে সেদিন আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। 'আর তো যা'দা দিন হিয়া রহনে কা জরুরত নাহি হোগা।'

আমি বললাম, 'আপভি তো খুশ হোগা।'

'হম তো সাহাব হর জগা পর খুশ হ্যায়। কাম চলতা হ্যায় তো হমারা খুশী ঔর ভি বড়তা হায়।'—ঠিকাদার সাহেব বলে।

"আজকের কাজে লছমী আসেনি। লছমীর একজন সহেলী কুলিকে প্রশ্ন করে জানলাম, যে আমার ডাক্তারীর ফলে লছমীর ছেলের অসুখ কমেনি বরং আজকে আরও বেড়ে গিয়ে ওর কাজে আসা বন্ধ করতে বাধ্য করেছে।

আমি আর প্রসাদ সাইডিং-এ রাখা স্টোন ট্রেনের দিকে অগ্রসর হলাম। লোকে যে যাই ভাবে ভাবুক ওর ছেলেটাকে বাঁচাতেই হবে। ওর সম্পর্কে সবকিছু না জেনেও বুঝেছি মেয়েটি ভাল। মেয়েটি ভালো বলেই সম্ভবতঃ ওর কপালে এত দুর্গতি।

ঠিকাদার কেশরীমল হঠাৎ হাঁক দিল—'ঠাহরিয়ে গার্ডসাহেব হাম ভি চলেঙ্গে।'

ঠিকাদারের পক্ষে লছমী হেন একজন সামান্য কুলি রমনীর ছেলের অসুখের জন্যে এত দরদ আমরা চিন্তা করতে পারিনা। ওর দরদ যে কোথায় সেটা অনুমান করেছি। ঠিকাদার স্বচ্ছন্দে লছমীকে আর পাঁচটা মেয়ের মত কুক্ষিগত করতে পারেনি। চেষ্টা সে যথেষ্ট চালিয়েছে। নিজের মান সম্ভ্রম রক্ষা করে, লছমীকে চুপি চুপি

গোপনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারেনি। সম্ভবতঃ তাই তার দরদ এত উথলে উঠলো। ওর অসহায় দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে উপস্থিত থেকে, ওর দুর্ব্বলতার সবচেয়ে বড় সুযোগটাকে কাজে লাগাতে পারলে তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

লছমীর কামরায় এসে পৌছিলাম। লছমী ঠিক খোলা দরজাটার সামনে, ছেলেটাকে কোলে করে বসে আছে।

আমরা যেতেই লছমী খুশী হল খুব। একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে উঠবার চেষ্টা করতেই প্রসাদ বলল, 'চুপ চাপ বৈঠ।'

ঠিকাদার জিজ্ঞাসা করলো গলায় যত সম্ভব মধু মাখিয়ে 'কবসে তেরা বাচ্চা বীমার হুায় লছমী?'

লছমী তার দৃষ্টিটা ঠিকাদারের মুখের উপর বুলিয়ে নিল। দৃষ্টিটা অকস্মাৎ জ্বলে উঠলো যেন। ওর জ্বালাময়ী দৃষ্টি না সরিয়েই কেশরীমলের প্রশ্নের উত্তর দিল, শান্ত গলায়, 'তিন চার রোজ সে।'

ঠিকাদার গায়ে কিছু মাখলো না। ও বিলক্ষণ জানতো যে ওর উপস্থিতিটা লছমীর একেবারেই কাম্য নয়।

আমি তিক্ত কিছু ঘটবার সম্ভাবনা দেখলাম। এবার ঠিকাদার অসন্তুষ্ট হলে লছমীই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটম বোমার সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ হয়না।

আমি গাড়ীর সামনে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার কপালে হাত রাখলাম। গা'টা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। আমি যতদূর সম্ভব আমার ডাক্তারীতে বাচ্চাটাকে পরীক্ষা করলাম। শিশুটির নাড়ী পরীক্ষা করে বুকে কান পেতে ওর বুকের স্পন্দনে রোগ ধরার চেষ্টা করলাম।

পরীক্ষা শেষ হলে প্রশ্ন করলাম, 'ওকে খানা কি দিচ্ছিস্?

লছমী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বাবু এতনা বুখারে খানা তো ঠিক নাই, বুখার কো তাগদ মিলে যাবে, বুখার সারবে না।'

এবার আমার আশ্চর্য হবার পালা, বলে কি মেয়েটা। বুখারের

তাগদ হবে বলে রোগীকে খেতে দেবে না। এদিকে রুগীটার যে তাগদ কমতে কমতে দুর্ব্বল হয়ে মরে যাবে।

ওর কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, 'তোর ঘরে তো বার্লি নেই। একজন লোককে দিয়ে জয়ন্তী থেকে বার্লি কিনে আনা আর ওষুধ কবার দিয়েছিস ?'

ও বলল, 'ওহি, কাল রাত্রে একহি বার।'

বললাম, 'আর একবার এখন ওষুধ দিয়ে দে।' ওর ওষুধের ব্যবস্থা করে প্রশ্ন করলাম, 'তোর জয়ন্তী যাওয়ার মত কোন লোক আছে ?'

লছমী বলল, 'মংরুকে বললে যানে সেকতা লেকিন উ'তো কামমে গয়া।'

ঠিকাদার খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলল, 'মংরুকে হাম ভেজ দেতা ঔর লছমী তুমকো ভি হাম আজ ছুটি করদেতা। পুরা হাজিরা মিল যায়েগা তুম'হে।

ঠিকাদার চলে গেল।

চিন্তিত হয়ে প্রসাদকে ইংরেজীতে বললাম, 'রুগীর অবস্থা বেশ খারাপ।'

প্রসাদ বলল, 'তা হলে ওকে বল ডাক্তার দেখানের ব্যবস্থা করুক। তুমি কেন ঝামেলা করছ ?'

আমি উত্তর দিলাম, 'ওকে বলে দিতে পার—কিন্তু ওর পক্ষে কি সম্ভব ? এই রুগী নিয়ে জয়ন্তীতে গেলে ঐ হাতুড়ে ডাক্তারের চেয়ে বেশী ভাল চিকিৎসক পাবে না, মাঝ থেকে ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে একটা কিছু করে বসবে ভালমন্দ।

প্রসাদ উত্তর দিল, 'তা হোক। আমি তোমাকে রিস্ক নিতে বারণ করছি। তুমি ডাক্তার নও তোমার কি দরকার। ওদের মৃত্যু এই ভাবেই হয়। ওরা ডাক্তার পায়ও না, দেখায়ও না। তুমি সরকারী চাকরী কর সেটা মনে রেখো।

অগত্যা প্রসাদের যুক্তি মানতে হল। লছমীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ব্যাপারটা বলা হল। ছেলেটা জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে। ইতিমধ্যে মংরুকে সঙ্গে নিয়ে ঠিকাদার স্বয়ং পুনরায় হাজির হয়েছে।

ঠিকাদারকে খুবই সহৃদয় মনে হল। ওদের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে ওদের পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করল।

ছেলেটা একেবারেই নেতিয়ে পড়েছে। গায়ে একটা জামা তো দূরের কথা, একখণ্ড সুতো পর্যন্ত নেই।

কিন্তু উপায় কি? কাপড় চোপড় জড়িয়ে কোনরকমে ওদের পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল।

বেলা প্রায় দুটো নাগাদ মংরু কোয়ারীতে ফিরে এল। মংরু খবর দিল ডাক্তার একজন পাওয়া গেছে। কেমন ডাক্তার সে বলতে পারবে না তবে ওষুধপত্র দিয়েছে। বলেছে ভাল হয়ে যাবে।

মংরু আমাদের জিজ্ঞাসা করল, 'বাবু লছমীর লেড়কা আচ্ছা হয়ে যাবেতো?'

উত্তর দিলাম আমি, 'সবই ভগবানের হাত।'

মংরু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'লেড়কা যদি না বাঁচে তো লছমী ভি মরে যাবে। উ'ভি বাঁচবে না বাবু।'

মংরুর কথা বলবার ভঙ্গি খুবই করুণ। ওর দীর্ঘশ্বাস যেন মনে হল পাঁজর ভেঙ্গে বেরিয়ে আসছে। লছমীর ভাল-মন্দের সঙ্গে মংরুর সুখ দুঃখের যেন গভীর সম্বন্ধ।

মংরুকে প্রশ্ন করলাম, 'হ্যাঁরে লছমী যদি না বাঁচে তাতে তোর কি? ও তোর কে হয়?'

একটু হকচকিয়ে গেল ও। ও আমার প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিল না। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'না বাবু উ হমার কোন রিস্তাদার নাই।'

আমি কণ্ঠে দরদ ঢেলে ওকে প্রশ্ন করলাম, 'তোর রিস্তাদার নয় তো তোর এত ভাবনা কিসের?'

ও আমার কথার সুরে কোন ভরসা পেল কিনা জানি না। একটু চুপ করে থেকে ও বলল, 'লছমী বহুৎ দুখিয়া ঔরৎ আছে। ওর খানদান কোন কালতু খানদান নাই বাবুজী। ওর পিতাজী ঔর ওর পতি বহুৎ পয়সাওয়ালা আদমী ছিল।'

প্রসাদ এতক্ষণ নিরাসক্ত ভাবে সব শুনছিল হঠাৎ কিসের গন্ধ পেয়ে সোজা হয়ে বসল। তারপর জেরা করার মত স্বরে মংরুকে প্রশ্ন করল, 'তুই লছমীর এত কথা কোথা থেকে জানলি?

মংরু উত্তর দিল, 'লছমী তো খুদ বলল হামাকে।'

আমি বললাম, 'তোকে বলল কেন? এত লোক থাকতে তোকে বোলে ফেলল?'

মংরু স্বাভাবিক কণ্ঠেই উত্তর দিল, 'লছমী সব কুলি লোগমে এক হামিকো সব কথা বোলতি হ্যায়।

প্রসাদ আবার জেরা করে বললে, 'তোকে সব বলে, তাহলে তোকে ও নিশ্চয়ই সকলের থেকে আলাদা করে দেখে। সাফ সাফ বলতো তুই ওকে পেয়ার করিস কিনা?'

মংরু একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বলে, 'ও তো হামি করছি বাবু বহুৎ পেয়ার করছি। উসকো লিয়ে হমারা জান ভি হাজির আছে।'

আমি বললাম, 'তা হলে তুই ওকে বিয়ে করছিস না কেন? ওকে বিয়ে করে ফেল তারপর একটা সংসার কর।'

মংরু মাথা নিচু করে উত্তর দিল, 'উ বাত হামি উসকো শ'দফে বলেছি, লেকিন উ নারাজ হয়ে যায়—'

প্রসাদ বলল, 'তাহলে ও তোকে পেয়ার করে না এই তো? তা হলে ও তোকে সব বাত বলছে। সব কাজ করাতে তোকেই ডেকে পাঠাচ্ছে—'বাধা দিয়ে মংরু বলল, 'নাহি বাবু ও আমাকে খুবই পেয়ার করে।'

আমি প্রশ্ন করি অবাক হয়ে 'তা হলে—?'

মংরু বলতে থাকে, 'ওর যো পহলা পতি ছিল উহ তো মরে

গেল। ইস খাতির উ বলে কি হিন্দু ঔরৎ এক্‌হিবার শাদী করে—।'
মংরু চুপ করে থাকে।

আমি মংরুর কাছে একটা প্রস্তাব করি—'আচ্ছা লছমী যদি রাজী হয় তাহলে তুই বিয়ে করবি তো?'

মংরু এক কথায় রাজী—অবাক হয়ে বলে, 'জি, জি হামিকো কোন এতরাজ নাই।'

আমি ও প্রসাদ দুজনেই লছমীর জন্য খুব চিন্তিত ছিলাম। লছমীকে আমাদের ভাল লেগেছিল। কেমন ভাল লেগেছিল তা ঠিক বলতে পারিনা তবে মেয়েটা জলে ভেসে না যাক সেদিন আমরা সেটাই চেয়েছিলাম।

মংরুর সঙ্গে কথা হওয়ার পরই আমরা তৎক্ষণাৎ লছমীর আবাসের দিকে রওনা হলাম।

লছমী ছেলেটাকে পাশে নিয়ে সম্ভবতঃ ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল। তার সেই অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে লছমীর কমনীয় নারীদেহের কোন কোন অনাবৃত অংশ মুহূর্তের জন্যে আমাদের দৃষ্টির সামনে ধরা দিয়েই আবার লুকিয়ে পড়ল লছমীর তৎপরতায়।

লছমী অসংবৃত বেশবাশ সামলে, উঠে বসে বলল, 'বাবু ডাগডার সাহেবের দাবাই নিয়ে এলাম। বাচ্চা হমার বাঁচিয়ে যাবে।'

লছমীর সঙ্গে আজে বাজে দু'চারটা কথা বলার পর বললাম, 'লছমী তুই আবার বিয়ে কর।'

লছমী আমার কথার কোন উত্তর দিল না। চুপ করে থাকল, মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

আমি আবার বললাম, 'তোর বয়স কম। তোর প্রতি পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। ঠিকাদারের মত অনেক লোক আছে। ও যে তোকে পাঁচটা টাকা দিল ও তা সুদে-আসলে উশুল করতে চেষ্টা করবে।'

লছমী হঠাৎ ক্ষেপে গেল, 'ঠিকাদার কি হামাকে ধার দিল

সে উসুল করবে ? উসকে পাশ তো হমার মজুরীর বহুৎ রুপিয়া বাঁকি আছে। উসমেসে কাটিয়ে লিবে।'

'সেটা তো বুঝলাম', আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। 'কিন্তু ঠিকাদার সেটা বুঝবে না। ও খুব সোজা চীজ্ নয়।'

প্রসাদ আমাকে থামিয়ে দিল। তারপর লছমীকে প্রশ্ন করল, 'তোর এই দলের মধ্যে কোন ভাল ছেলে নেই ? এমন কোন যবান ছেলে সৎ আর তোকে বিয়ে করতে পারে ?'

প্রসাদের কথায় কিছু ফল হল, লছমী একটু চুপ করে থেকে বলল, হায় বাবু! এক লড়কা হ্যায়। বহুৎ নেক দিল লড়কা। ঔর হমাকে পেয়ার ভি করে।'

আমরা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে লছমীর মুখের দিক চেয়ে রইলাম। লছমীর চোখে একটা কেমন ভাবপ্রবণ চাহনী। ও বলে চলল। 'উ যবান মরদ আছে বাবু বহুৎ সুন্দর বাঁশরী বাজায়। উ হমার দিল মে জগহা বানিয়েছে বাবু। হামার ভি দিল উসকো বহুৎ চাহতা হ্যায় লেকিন' —লছমীর কণ্ঠ করুণ হয়ে এল, ও চুপ করে থাকল।

প্রসাদ বলল, 'কি হল থামলি কেন ? ছেলেটি কে ?'

লছমী আবার বলতে আরম্ভ করে 'উ হামকো শাদী ভি করতে চাইল। লেকিন হমার দুসরী শাদী হবে নাই বাবু।'

আমি উৎসাহ দিয়ে বলি, 'হবে না কেন ? আজকাল মেয়েদের দু'বার বিয়ে হওয়ার কোন বাধা নেই। তুই বল ছেলেটা কে ?'

লছমী আমার দিকে একবার সরাসরি তাকিয়েই চোখের পলক নামিয়ে নিয়ে বলল, 'মংরু, মংরু হামাকে শাদী কোরতে চাহল।'

'ঠিক আছে আমরা মংরুর সঙ্গে তোর বিয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এই কোয়ারীতেই তোদের বিয়ে দিয়ে দিব।' প্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দায়ীত্ব নিয়ে বলে ফেলল।

আমরা দু'জনেই ওর উত্তর শোনার জন্তে উদগ্রীব হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। লছমী কি বলে কে জানে।

লছমী একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'না বাবু ই শাদী হোনে বালা নাই। হামার পতি এখন্ ভি হমার স্বপ্নোতে আসে। হামার বাচ্চার জান বাঁচবে না বাবু। হামি হিন্দু ঔরৎ আছি, হামার দুবারা শাদী হয় না।'

ওর কণ্ঠের দৃঢ়তা এবং আত্মবিশ্বাস দেখে আমাদের মুখে কোন কথা সরল না।

আমাদের খুব অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। ওখান থেকে সরে আসতে চাইছিলাম, ওকে বললাম, 'ঠিক আছে তুই বিয়ে করতে চাস না ভাল কথা। তাহলেও ভেবে দেখিস যদি মংরুকে বিয়ে করতে চাস তাহলে বলিস।

লছমী কাঁদছিল। চোখ দুটো মুছে বলল, 'বাবু তোরা হামাকে উ কাম করতে বলিশ না, হামার পাপ লাগবে। হামার বাচ্চার ক্ষতি হবে। তোরা তো হামার পিছলী জিন্দেগী জানছিস নাই। হামি ভিখারীন ক বিবি নাই ছিলাম। হামার বাপ বহুৎ আমির ছিল নাই লেকিন রূপাইয়া পয়সাবালা ছিল।

আমি লছমীকে বললাম, 'তোর 'বিতে দিনের' কথা যদি আমাদের বলতে আপত্তি না থাকে তবে আমাদের বলতে পারিস।'

লছমীর অনুরোধে আমরা ওয়াগনটার দরজার দু'পাশে বসলাম।

এই পর্যন্ত গল্প বলা হলে গল্পে ছেদ হল। রানিং রুমের ঠাকুর খাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া করতে আরম্ভ করল। আমরা দুপুর বেলায় রানিং রুমের খাওয়া দাওয়া সেরে যখন এলাম তখন ঘুম পাচ্ছিল ভীষণ। গত রাত্রিতে সকলের দুরন্ত ডিউটি ছিল। রাত জাগরণের ক্লান্তি সকলেই অনুভব করছিলাম তবুও বাকি গল্প শেষ আমাকে করতেই হবে। নইলে ওরা ছাড়বে না। কাজেই আবার লছমীর গল্প, লছমীর জবানীতে পরিষ্কার বাংলায় বলতে সুরু করলাম।

বারো

লছমীর অতীতের কথা

আমার দেশ কোথায় ছিল আমি জানি না। আমার মাকেও আমার মনে নেই। জননী আর জন্মভূমি আমার জ্ঞান লাভ করার আগেই হারিয়েছি। সম্ভবতঃ দেশে আমার বাবার মন টিকেনি তার পরে। আমাকে নিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে শেষে রাঁচী জেলার এক গ্রামে বাড়ী করেছিল।

আমার ভাল করে জ্ঞান হলে আমি দেখেছি আমাদের জমি জায়গা যথেষ্ট আছে। বাবার কাছে শুনেছি আমার জন্মের পরেই বাবার হাতে প্রচুর অর্থ আসে। মা সেই কারণে আমার নাম রাখেন লছমী।

মা'র মৃত্যু হলে বাবা মনঃকষ্টে দেশত্যাগ করেন। বাবা আমাকে নিয়ে আমার বড় হওয়া অবধি খুব হাঁসিখুশিতে ভরিয়ে রেখেছিলেন।

বাবার অসীম ভালবাসা আমাকে কোনদিনই মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। শৈশব ও বাল্যকাল আমার সুখের স্রোতে ভেসে গেল। তারপর আমার শরীরে যৌবনের ছোঁওয়া লাগল। বরাবরই আমি একটু বাড়ন্ত গড়নের ছিলাম। আমার মনে একটা বেপরোয়া ভাব ছিল। কিন্তু যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সংগেই এল বিপদ। সব বয়সের পুরুষদেরই একটা লোভী দৃষ্টি আবিষ্কার করতে শিখলাম। যুবক থেকে বৃদ্ধ সকলেই এক। আমি যেন একটা খাওয়ার বস্তু। বাবা ছাড়া আর সব পুরুষকেই মনে হল খাদক।

স্বাভাবিক ভাবেই আর পাঁচটা মেয়ের মতই উঠতি বয়সের ছেলেদের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম। কিন্তু কি একটা ভয়ে আমি সর্ব্বক্ষণ আড়ষ্ট থাকতাম। হুঁশিয়ার থাকতাম।

আমার মা নেই। বাবা সরল প্রকৃতির লোক। মেয়ে বড় হয়ে উঠলে যে তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিতে হয়, তাঁর জানা

ছিল না। কিন্তু যে মেয়ে ছেলেবেলায় মা'কে হারায় তাকে নিজে থেকেই অনেক কিছু বুঝে নিতে হয়। তাই এই ব্যাপারে আমি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিলাম।

বাদ সাধল গ্রামের লোকেরা। আমার যৌবন সম্ভবতঃ তাদের জানিয়ে দিচ্ছিল। ওরা বাবাকে ধরল যে আমার অনেক বয়স হয়েছে ঘরে আর রাখা উচিত নয়, চটপট আমার বিয়ে দিয়ে বিদেয় করা দরকার।

বাবা প্রথমটা একটু আপত্তি তুলেছিলেন আমার বয়স কম বলে। কিন্তু গ্রামের মাতব্বরেরা বাবাকে এক কথায় থামিয়ে দিল। ওরা বাবাকে শ্রদ্ধা, সম্মান করে সেই জন্যে ওরা বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করেছে। ওদের মেয়েদের আরও অনেক অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়। আর তাছাড়া আমার চালচলনে ওদের কোন বিশ্বাস নেই। আমি নাকি ওদের অল্পবয়স্ক ছেলেদের নষ্ট করে দিচ্ছি।

বাবার ঐ গ্রামে যথেষ্ট সম্পদ ও প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং, বাবার পক্ষে ওদের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

ঐদিন থেকে পুরুষ জাতটার প্রতি আমার ভয়ানক একটা বিতৃষ্ণা ভাব এল।

অল্পদিনের ভিতরে আমার বাবু আমার জন্যে একটা পাত্র ঠিক করে ফেলল। পাত্র কয়লা খনিতে হেড্ খালাশীর কাজ করে। দেখতে বেশ যোয়ান, তাগড়াই মরদ। খনিতে কোয়ার্টার আছে।

আমার বিয়ে হয়ে গেল ঐ অপরিচিত লোকটার সঙ্গে। আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে। স্বামী যে স্ত্রীলোকের দেবতা সেই কথাটাই ভাবতে শিখেছিলাম। সুতরাং, বিয়ের পরে বাবাকে ছেড়ে যত কষ্টই হোক, কাঁদতে কাঁদতে বাবার ঘর ছাড়লাম। বাবা একাধারে আমার বাবা এবং মা দু-ই ছিলেন।

লেখাপড়া তো জানি না। আমার স্বামী যা বলত তাই আমার কাছে নূতন, অভিনব। অনেক নূতন কথা শুনতাম তার কাছে।

আর লোকটিও ছিল খুব চমৎকার। আশে পাশের আরও কিছু খালাসী ও কুলির কোয়ার্টার ছিল।

আমার স্বামীর সঙ্গে বাবু স্টাফদের অনেকেরই খুব খাতির ছিল। শুনতাম আমার স্বামীর অনেক ক্ষমতাও ছিল। অনেকেই অনেক অসুবিধার কথা বলতে প্রায়ই আসত। আমার স্বামী উপরওয়ালাদের কাছে তদ্বির করে তাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দিত।

বিয়ের পর স্বামীর ভালবাসা আমাকে রাণী করে দিয়েছিল। আমাকে আদর সোহাগ করে আমার নূতন জীবনটাকে ভরিয়ে তুলেছিল।

আমাকে প্রায়ই জড়িয়ে ধরে বলত, 'তুই আমার লছমী, আমার ঘরের লছমী। তুই আমার ঘরের রাণী হয়ে থাক।'

আমিও বলতাম, 'তাহলে তুমি তো রাজা।'

ও আবেগে জর্জ্জরিত হয়ে বলত, 'আগে ছিলাম না এখন মনে হয় সত্যিই আমি রাজা। আমি সবকিছু পেয়েছি। আমি রাজার মত ঐশ্বর্য্য পেয়েছি। কিন্তু আমি তোর কাছে রাজা নই।' বলে আমাকে বুকের মধ্যে এমনভাবে চেপে ধরত যে মনে হত দম বন্ধ হয়ে যাবে।

অনেক কষ্টে ছাড়া পেয়ে বলতাম, 'তুই রাজা, তুই আমার রাজা। রাজা না হলে রাণী আসে কোথা থেকে।'

সুখ, অফুরন্ত সুখ, আকাশভরা আলো, আর বুকভরা সুগন্ধি নিশ্বাস আমাকে আরও সুন্দর করে তুলল। আমার এতই অহঙ্কার হল যে আমি অধিকাংশ সময় আমার জন্মদাতা বৃদ্ধ পিতার কথাও ভুলে থাকতাম।

আমাদের অনন্ত ভালবাসার জোয়ারে এক অমৃতের খণ্ড ভেসে আসবার সম্ভবনা দেখা দিল। দূরাগত এক সঙ্গীতের লহরী শুনতে পেলাম আমি। সেই লহরী আমার তন্ত্রিতে তন্ত্রিতে তুলতে লাগল এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী সঙ্গীতের সুর। সে সুর আমার স্বামীর কানেও পৌঁছে গেল।

স্বামী যেদিন জানতে পারল সেদিন আমাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত আদর করল। বলল, 'লছমী এবার সত্যিই আমি আমি রাজা হলাম রে। বল, রাজা কিনা বল'? লোকটা পাগল হয়ে গেল যেন।

আমি কথা বলব কি ওর কাণ্ড দেখে হেঁসে কূল পাচ্ছি না। শেষে অনেক কষ্টে বললাম, 'রাজা নয়, তুমি বাদশা হয়েছ, বাদশা'। দুই চোখে আমার দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'ঠিক বলেছিস, আমি বাদশা হয়েছি আর তুই আমার বেগম, বলেই আমাকে তাড়া করল নূতন করে হুজ্জুতি করবার ইচ্ছায়। তার আগেই আমি ছুটে বাইরের বারান্দায় গিয়ে লক্ষ্মী মেয়েটির মত দাঁড়িয়ে থাকলাম।

যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে পারি না। আর ঘরের মধ্যে থেকে আমার পরাজিত স্বামী নিষ্ফল ক্রোধে আস্ফালন করতে থাকল। সে সব আবেগমধুর দিনগুলো আমি জীবনে ভুলতে পারব না। আমার কান্না এসে যাচ্ছে। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

রোজ দুপুরে খাবার নিয়ে যেতে হত আমাকে। অন্য কুলি খালাশীদের বৌ ঝি'রাও তাদের বাড়ীর পুরুষদের খাবার নিয়ে যেত।

আমার স্বামী প্রথমে একজন বাচ্চা মেয়ে রেখেছিল এই কাজের জন্য কিন্তু আমার ভাল লাগেনি। একতো ওকে পয়সা দিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ অন্য হেড খালাশীর বাড়ীর মেয়েরা নিজেরাই ঐ কাজ করতো। তাছাড়া আমার স্বামীর খাবার বয়ে নিয়ে যেতে আমার নিজেরই খুব ভাল লাগত।

আমার সঙ্গে আছে আমার সারা জীবনের শত্রু আমার রূপ আর যৌবন। গরীব লোকেদের সুন্দরী বৌ মেয়ে থাকা ভয়ানক পাপ। যাদের টাকা আছে তাদের জন্যেই এই পৃথিবীর সবকিছু।

গ্রামে আমি আমাদের বিত্তবান মনে করতাম কিন্তু এই কোলিয়ারীর বিশাল বিস্তৃত মাঠে এসে দেখলাম আমরা ক্ষুদ্র, অতি মাত্রায় ক্ষুদ্র।

আমার স্বামী একটা গাছের তলায় বসে খাচ্ছে। আমি তার সামনে বসে গল্প করছি।

এমন সময় একজন প্যান্ট কোটপরা ভদ্রলোক ওখানে এসে হাজির হল। আমার স্বামী ওকে দেখে একটু জড়সড় হয়ে পড়ল। আমি আমার মাথার ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিলাম।

লোকটির মুখের হাসিটি অত্যন্ত নোংরা। মুখটা চৌকো ধরনের, কোটরভর্ত্তি এক জোড়া মারবেলের মত বড় বড় চোখ। সেই চোখ দুটো দিয়ে ও যেন আমার সর্ব্বাঙ্গ গ্রাস করছিল।

আমার এত বিশ্রি লাগছিল। বুঝতে পারছিলাম যে লোকটি আমার স্বামীর উপরওয়ালা। যার জন্যে আমার স্বামীও বাক্যহারা হয়েছিল। বাধ্য হয়ে আমি আস্তে করে আমার স্বামীকে বললাম, 'আমি বাড়ী যাচ্ছি।'

ঐ লোকটা শেয়ালের মত ক্যা ক্যা করে হেঁসে বলল, 'এই বুঝি তোর বউ?'

আমার স্বামী শুধু বললেন, 'হ্যাঁ।'

'তা বেশ সুন্দরী বৌ পেয়েছিস্।' লোকটার ইঙ্গিতে আমি লজ্জায় মরে যেতে চাই।

'ভাল—বেশ সুখে আছিস।' বলে লোকটা চলে গেল গট্ গট্ করে।

আমার স্বামী বললেন, 'তুমি যাবে কেন বস। ঐ লোকটা এরকমই। ওর কথাবার্ত্তা যেমন কুৎসিত ওর স্বভাবটাও সেই রকম কদর্য। কোনও লোকই ওকে পছন্দ করে না। শালা ফোরম্যান হয়েছে তো মাথা কিনে নিয়েছে।'

আমি ভয় পেলাম। চুপ করে থাকলাম।

আমার স্বামী বিড় বিড় করে বললো, 'সেরকম বেচাল দেখলে শালাকে একেবারে খতম করে দেব। প্রাণের থেকে আমার ইজ্জৎ বেশী।'

খাওয়া হয়ে গেলে আমি বাড়ী আসার পথে চিন্তা করছিলাম। নিজের উপর নিজের ঘেন্না হচ্ছিল। সমস্তই বুঝছিলাম। মেয়েদের এসব ব্যাপারগুলো বুঝতে খুব বেশী কষ্ট করতে হয় না।

লোকটি ফোরম্যান। অর্থাৎ আমার স্বামীর ক্ষমতাশীল উর্দ্ধতম অফিসার। ওর সঙ্গে লড়তে গেলে আমার স্বামীরই বিপদ বেশী। ওকেই ধ্বংস হতে হবে।

এতএব আমার কর্ত্তব্য আমি ঠিক করে ফেললাম। খাদক যখন অন্বেষন করে তখন অসহায় শিকার নিজেকে রক্ষা করতে হলে শিকারীর দৃষ্টি থেকে সরে থাকবে।

আমি সাবধান হলাম। কিছু দিনের মত কোন অশান্তি হলনা ওই ব্যাপারে। কিন্তু বাঘ একবার হরিনের গন্ধ পেলে ওৎপেতে লুকিয়ে থাকে। শিকারের চেয়ে সে অনেক বেশী ধুরন্ধর! আমি যখন একদিন খাওয়ার দিয়ে ফিরছি তখন হঠাৎ একটা ঝোপের আড়াল থেকে তার উদয় হল।

আমি প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলেও তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে নিজের সুন্দর মুখটাকে আড়াল করলাম।

লোকটা দাঁত বের করে হাঁসতে হাঁসতে বলল, 'তুই হেড খালাশীর বৌ না? কি নাম যেন তোর?'

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

ও বলল, আরে এত রূপসী তুই, তোর নামটাও নিশ্চই তেমনি সুন্দর হবে, কি নাম তোর?

আমি বিরক্ত হলাম খুব। আশে পাশে কাউকে দেখছি না। সময়টা দুপুর বলে খুবই নির্জ্জন। বললাম, 'রাস্তা ছেড়ে দিন।'

'বাবা! বিষ নাই তার কুলোপানা চক্কর। ও সব রাগ অন্য জায়গায় দেখাস। বল, তোর নাম বল, রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছি।'

দেখলাম উপায় নাই বললাম, 'লছমী,'

'সাবাস। যেমন নাম তেমন রূপ' লোকটা আবার তার কুৎসিত

পানখাওয়া ঝিঙ্গের বিচির মত দাঁত গুলো বার করে বলল, 'তা হ্যাঁরে, তোর মত খুপসুরত জিনিস কি ঐ হেডখালাসীর ঘরে থাকবার জন্যে ? খড়ের ঘরে বিজলী বাতি কি হবে ?'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে ওর কথার উত্তর না দিয়ে বললাম, 'সরুন' বলার সঙ্গে সঙ্গে চলবার উপক্রম করলাম।

ও পথ রোধ করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল,'কোথায় যাবি। আমার কথা শোন, আখের ভাল হবে। আমি তোকে রাণী বানিয়ে দেব, তুই আমার একান্ত নিজস্ব হয়ে থাকবি, বড় বড় মোটরওয়ালা সাহেবদের বাংলোতে বাংলোতে মজা করে ঘুরবি—'

আমি আর শুনতে পারছিলাম না। আমার প্রলোভন উৎপাদন করা দূরে থাক, আমার প্রচণ্ড ক্রোধ উৎপন্ন হচ্ছে ওর কথায়।

এক ধাক্কায় ওকে ফেলে দিয়ে আমি দ্রুত পা চালালাম কিন্তু লোকটা একটা কদর্য্য নোংরা। আমার চলমান পশ্চাৎভাগের দিকে তাকিয়ে, চিৎকার করে একটা অশ্লীল কথা উচ্চারণ করল।

সেটা শোনার ইচ্ছে না থাকলেও শুনতে হল।

শেষে চিৎকার করে বলল, 'আরে যা, যা ওরকম কত মাগীর দেমাক ঠাণ্ডা করে দিয়েছি, তুইতো কোন্ ছার।'

অনেক কিছু চিন্তা করে আমার স্বামীকে এ সমস্ত ঘটনার কিছুই জানালাম না। আমার মন তখন এক নুতন অতিথির ভাবমূর্তিতে আচ্ছন্ন। আমার স্বামী আমার কাছে বিশাল মহিরুহ। তার আশ্রয়ে স্বাচ্ছন্দে, শান্তিতে, জীবনটাকে এলিয়ে দিয়েছি আর যে আসছে, সে আমাদের ভালবাসার সাক্ষী, ঐ মহিরুহের একটা সবুজ অঙ্কুর।

ঐ সবুজ ফলটা ক্রমে সতেজ হয়ে উঠেছে। টের পাচ্ছিলাম আমি। একটি নবাগত প্রাণের স্পন্দন। আমার সমস্ত দেহমন জুড়ে আমার স্বামীর আর আগত সন্তানের চিন্তা। সেখানে ঐ দন্ত-নখর বিশিষ্ট পশুটার কোন ছবি আসার কোন সম্ভবানাই ছিল না। কিন্তু আমার স্বামীকে ঘটনাটি না জানানোর প্রধান কারণ তাকে

অশান্তির মধ্যে টেনে না আনা। কোন স্বামীই তার স্ত্রীর অপমান সহ্য করবে না। আমার স্বামীকে আমি যদি উত্তেজিত করি তা হলে সেই উত্তেজনার আগুনে তার ভস্মিভূত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সেক্ষেত্রে আমার লোকসানই ষোল আনা।

কিন্তু তখন বুঝিনি ঐটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম ভুল।

অবশেষে যে আসার সে এল। আমাদের মত অতি সাধারণ লোকের ঘরে এল এক স্বর্গীয় দেবশিশু। আমার আর আমার স্বামীর মিলিত অবয়ব নিয়ে আমাদের সন্তান জন্মাল।

ওর বাপের মুখে হাসি আর হৃদয়ের অফুরন্ত ভালবাসায় আমার বুক গর্ব্বে ফুলে উঠলো।

আমার স্বামী বলল, 'ওর নাম কি হবে লছমী? তুই খুব বুদ্ধিমতি, ওর একটা চমৎকার নাম দিবি কিন্তু।'

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে কপট নিরাসক্তি দেখিয়ে বললাম, 'ওর নাম আমি কি জানি। ও তোমার ছেলে, তুমিই ওর নাম রাখ।'

আমার স্বামীও কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললেন, 'ও:, ও শুধু আমার ছেলে? তোর কেউ নয়?'

আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললাম, 'তোমার ছেলের নাম হল রাজকুমার।'

স্বামী খুশী হয়ে উত্তর দিল, 'বা: চমৎকার নাম দিয়েছিস। আমি রাজা আর আমাদের ছেলের নাম রাজকুমার।'

কিছু দিন আগে আমার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু সে খবর আমাকে কেউ জানায়নি। ঐ গ্রামে আমাকে খবর দেওয়ার মত কেউ ছিল না। ছেলে হওয়ার পর ঐ ছুতায় আমি সন্ধ্যায় ও দুপুরে খাওয়ার নিয়ে যাওয়া বন্ধ করেছিলাম। পাড়ার একটি মজুরের মেয়েকে দিয়ে পাঠাতাম। মেয়েটাকে পয়সা কড়ি দিতে হত না। মাঝে মাঝে টুকিটাকি খাবার দাবার খেত। তাইতেই খুশী থাকতো।'

লছমী একটু চুপ করে থাকলো। ওর চোখে মুখে ফুটে উঠলো এক অপূর্ব্ব ভাব। আত্মগরিমায় বিভোর সে চোখের দৃষ্টি।

ও আবার সুরু করল, 'আমার ঐ স্বামী পুত্রের সান্নিধ্যে আমার বাবার কথাও আমার মনে আসত না—কিন্তু সেই সময় সাক্ষাৎ রাহুর মত শয়তান ফোরম্যান আবার আমার পেছনে লাগল।

কোলিয়ারীতে যাওয়া বন্ধ করায় ফোরম্যান স্বয়ং আমাদের কোয়ার্টারে এসে হাজির হল।

আমার স্বামী প্রথমটা খুব অবাক হলেও তার আসার কারণ বুঝতে দেরী হল না। তবুও ভদ্রতা করে তাকে বসতে বলল।

লোকটা ড্যাব ড্যাবে চোখ করে বলল, 'কিরে তোর ছেলে হয়েছে আমাদের তো দেখালি না।'

আমার স্বামীর নির্দ্দেশে ছেলেটাকে কোলে করে নিয়ে এলাম আমার স্বামী বলল, 'আমাদের ছেলে আর কি দেখবেন স্যার।'

'আরে তোদের ছেলেটা আলাদা কিসের।' বলে পকেট থেকে সরু একটা সোনার চেন্ বার করে দিতে গেলে আমার স্বামী বাধা দিয়ে বলল, "না না ওকে ওসব দেবেন না স্যার। আমরা গরীব মানুষ আমাদের ওসব লোভ দেখাবেন না। ছেলে বড় হয়ে নবাবী শিখবে।'

'আরে আরে একি করছিস্, ছেলেকে দিচ্ছি পরবে তো তোর বউ। তোদের সম্পত্তি হয়ে থাকবে। আর তোকে আমি এবার প্রমোশন দিয়ে দেব ফিটারে। তোর ভাবনা কি আছে!' লোকটার চোখ দুটো বাসনায় জ্বল জ্বল করছে।

আমি ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেলাম ঘর থেকে। আর ফোরম্যান সাহেব পরিত্যক্ত চেনটি তুলে নিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।

ও চলে যেতে আমার স্বামী বলল, 'বেটা, জানে না কত ধানে কত চাল, আমি ওকে শিক্ষা দিয়ে দেব।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কথা বললে ওর উত্তেজনাকে আরও উসকে দেওয়া হবে।

কয়েকদিন পরে সন্ধ্যা বেলায় আমি ছেলেটাকে ঘুম থেকে তুলে দুধ খাওয়াচ্ছি। আমার স্বামী অফিস থেকে ফিরে আবার বাইরে গেছে। কাছেই কুলি বস্তিতে রামলীলা হচ্ছে সেখানে।

হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো মূর্তিমান শয়তানটা। সেই দাঁত বারকরা হাঁসি।

'আরে লছমীরানী কি ফালতু কাজ করছিস? বাঁদী বনে থাকতেই তোর ভাল লাগে।' লোকটার কথায় বিশ্রি ব্যঙ্গ।

ভয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কাঠ হয়ে গেছে। তবুও বললাম, 'এখুনি বেরিয়ে যান এখান থেকে। আমি চিৎকার করব।'

'চিৎকার তুই কর্‌বি না, তোরই ইজ্জৎ যাবে। মহল্লাবালারা তোকে আর এখানে থাকতে দেবে না।' লোকটার কণ্ঠে পরম নির্ভরতা।

ছেলেটা আমার কোলে। আমি হতভম্ব। মাথায় গায়ে কাপড় দিতে ভুলে গেছি। পায়ের কাপড় আমার গুটিয়ে হাঁটু পর্য্যন্ত উঠে গেছে।

আমি ভুলে গেছি আমার সর্ব্বশরীরের অবাধ্য যৌবন লোকটার দুচোখে নেশা জাগাচ্ছে। উত্তেজনার সৃষ্টি করছে ওর কদর্য্য হৃদয়ে। রাক্ষসটা আমার দিকে এগিয়ে এল।

আমার জ্ঞান কিছুটা যেন ফিরে এল। আমি আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে ছেলেটাকে চৌকিটার উপর শুইয়ে দিয়ে নেমে দাঁড়ালাম।

লোকটা আমার দিকে এগুচ্ছে পায়ে পায়ে আর বলছে, 'ভয় পাচ্ছিস কেন. আমি বাঘ না ভালুক? তোকে এত সুখে রাখব তুই ভাবতেও পারবি না। তোর ছেলেকে সোনার হার দেব। তোকে সোনা দিয়ে মুড়ে দেব। তোর স্বামীর প্রমোশন দিয়ে দেব।'

ও আমার কাছে এসে পড়েছে। আমি চেষ্টা করছিলাম দরজা দিয়ে ভিতরে চলে যেতে। আমি বাক্যহারা। লোকটা একেবারে সম্মুখে এসে পড়েছে। ওর নিশ্বাসের গন্ধ পাচ্ছি।

কিন্তু আমার স্বামী, আমার দেবতা, (ঐ মুহূর্তে সে আমার বিপদতারণ মধুসূদন) ঘরে ঢুকে পড়ল। পেছন থেকে লোকটার কাঁধ ধরে এক হেঁচকা টান দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এক বিরাশি সিক্কার চড় বসিয়ে দিলেন। লোকটা বাপ্ বলে মাটিতে বসে পড়ল।

তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোর কিছুই ক্ষতি হত না—কিন্তু তুই—তুই আমাকে যে মারলি তার শাস্তি—'

আমার স্বামী ওর জামার কলার ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'বেরিয়ে যাও শূওরের বাচ্চা—আর কখনও এমুখো হলে প্রাণটাও শেষ করে দেব। কুত্তা কাঁহাকা।'

লোকটা আরও কিছু বলবার চেষ্টা করতেই আমার স্বামী ওর ঘাড় ধরে চিৎকার করে উঠলেন, 'চোপরও বেয়াদব জানোয়ার, একটা কথাও নয়।'

লোকটাকে বার করে দিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, 'তুই ভাবিস না একটুও আমার জান থাকতে তোর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না।'

এতক্ষণ মনের উপর দিয়ে যে ঝড় বইছিল তা হঠাৎ কান্নায় পরিণত হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে আমি, লজ্জায়, দুঃখে, অভিমানে বিধ্বস্ত আমি, প্রাণ খুলে কাঁদতে লাগলাম।

কিন্তু ছেলেটা কেঁদে ওঠায় আমার পরম শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটল। আমি হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে কোলে নিলাম। আমার স্বামী বলতে লাগলেন,'লছমী এখানে আমরা বেশীদিন থাকতে পারব না মনে হচ্ছে।'

একটু চুপ করে থেকে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'চল বাচ্চাটার মুখে ভাত হয়ে গেলেই এ কোলিয়ারী থেকে চলে যাব। তার আগে কোম্পানী থেকে কিছু পাওনা টাকা পয়সা উদ্ধার করে নিতে হবে। আর যে সব কথা আমাদের মধ্যে হল তা আমাদের একান্ত নিজস্ব।

সকাল বেলা ছেলের মুখে প্রসাদী দিয়েছে। পণ্ডিতজী পূজা করে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির থেকে পুজো দিয়ে প্রসাদ এনে দিয়েছিলেন।

রাত্রে দুচার জনবন্ধু-বান্ধব খাওয়ার কথা। নেমন্তন্ন করা হয়েছে। সেদিন ওর ছুটি নেওয়া আছে। বেলা তিনটের সময় কারখানা থেকে একজন এসে আমার স্বামীকে কি বলল। আমার স্বামী আমাকে ডেকে বললেন, 'আমি একটা বিশেষ কাজে যাচ্ছি। তুমি রাজকুমারকে সাজিয়ে রাখ। আর রান্নার যা বাকি আছে সে সব ঠিক করে নিও গীতাকে নিয়ে। বিকেলে রাম কৃপালের বউ আর বোনও এসে যাবে।'

আজকের দিনে ওকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু উপায় কি, কোম্পানীর কাজ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত দেরী হবে?'

আমার মুখের দিকে চেয়ে উনি বললেন, 'আরে বেশীক্ষণ নয়, সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আসব।'

আমাদের কাজ কর্ম শেষ করতে করতে কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে বুঝতেই পারিনি। ঘর দুয়ার পরিচ্ছন্ন করে অতিথির বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

অতিথিরা এসে পড়লো। কিন্তু আমার স্বামীর ফেরবার নাম নেই। ক্রমে রাত্রি বেড়েই চলল। অনেক অনুনয় বিনয় করে অতিথিদের খাওয়াতে রাজী করলাম।

অতিথিরা খেতে খেতে আলোচনা করছিল আমার স্বামীর দেরীর কথা। এত দেরী হওয়াটা ওদের কাছে অস্বাভাবিক ঠেকছে। আর আমার কাছে? আমার মনে হচ্ছিল আমার কি যেন হারিয়েছে। আমার সমস্ত দেহমন এক অজানা আশঙ্কায় হিম হয়ে যাচ্ছিল।

স্বামীর বন্ধুদের মধ্যে দুজন বলল, 'আপনি বাড়ীতেই থাকুন আমরা ওকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি। আর মেয়েদের মধ্যেও দু'তিন জন আমার সঙ্গে আমার স্বামী ফিরে না আসা পর্য্যন্ত থাকতে চাইল।

তারপর অনেকক্ষণ কেটে গেছে রাত্রির বয়স আরও বেড়েছে, আরও থম্‌থমে হয়ে গেছে, আমার চোখে একটু তন্দ্রামত এসেছে, হঠাৎ দেখলাম আমার স্বামী এসে পড়েছেন, আমাকে ডাক দিলেন, 'দরজা খোল, বড় দেরী হয়ে গেল।'

স্বামীর ডাকে আমার তন্দ্রা টুটে গেল। আমি ধড়ফড় করে উঠে দরজা খুলে দিলাম। নাঃ কেউ আসেনি। আমার ঘরে যে মেয়েরা ছিল তারা বলল যে না কেউই ডাকাডাকি করেনি।

আমি বুঝে ফেললাম, আমার আশঙ্কা সম্পূর্ণ। সত্যি আমার সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসেছিল। আমাকে একবার দেখে গেল। আমি চিৎকার করে কেঁদে যাচ্ছি, কারুর আশ্বাসই আমার মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারল না।

ইতিমধ্যে যাঁরা খবর আনতে গিয়েছিলেন ফিরে এসে যা বললেন তা কোন নুতন কথা নয়। আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই।

আমার স্বামীর মাথায় ক্রেন থেকে ছুটে একটা ড্রাম পড়ে গেছে। ড্রাইভারের ভুলে ব্যাপারটা ঘটেছে। স্বামীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পরদিন আমার স্বামী ফিরে এল : ফিরে এল বিভৎস, মৃত একটা ·· থাক ওকথা আর মনে করতেও আমার কষ্ট হয়।

স্বামীর কাজ যেদিন শেষ হল সেদিন ঘরে যা ছিল তাই সম্বল করে, বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে, ঐ তল্লাট ত্যাগ করেছি।

আমাদের গ্রামে যেয়ে আর একবার বজ্রপাত হল আমার মাথায়। স্বামী খুইয়ে, যার আশ্রয়ে গেলাম তিনিও নেই। বহু আগেই তার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু সেই সংবাদটা আমার কাছে পৌছয়নি।

আমি জানতাম যে আমার বাবার কিছু জমি ও সম্পত্তি ছিল। কিন্তু গ্রামে যেয়ে জানতে পারলাম আমার বিয়ের সময় সে সমস্ত সম্পত্তি তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন।

অর্থাৎ স্বামী ও পিতাকে হারিয়ে আমি পথে বসলাম। আমার

ছেলে হল অনাথ। ঐ গ্রামও ছাড়লাম। গ্রামবাসীদের ব্যবহারে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। কিন্তু আমার রাজকুমারের মুখের দিকে চেয়ে···রাজকুমার! আজকে ঐ নামটাই ওর প্রতি এক চরম উপহাস।

যাই হোক সঙ্গের সবকিছু ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেল। সম্বল যতদিন ছিল অর্থ রোজগারের কথা ভাবিনি। কিন্তু যেদিন সেই সেই শেষ কপর্দকটা পর্যন্ত গেল সেই দিনই মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

কিন্তু আমার মত অভাগীর ভাগ্য ভাল হয়েছিল সেদিন। এই কুলি সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারই মাধ্যমে এসে হাজির হলাম এই পাথরের গাড়ীতে।

ঠিকাদার অনেক চেষ্টা করেছে আমাকে হাতাবার। কিন্তু আমার মনের মধ্যে আমার স্বামীর স্মৃতি খুবই উজ্জ্বল। আমার স্বামীর নিদর্শন আমার এই ছেলে। এ বেঁচে থাকলে আমিও বেঁচে থাকবো।

॥ তের ॥

লছমীর সমস্ত কথা জানলাম। রহস্যময়ী লছমীর রহস্য উন্মোচিত হল। মেয়েরা ছলনাময়ী—মেয়েদের মন নাকি কেউ জানতে পারে না।

আমার মনে হল মেয়েদের বাধ্য হয়ে ছলাকলার আশ্রয় নিতে হয়। মেয়েরা ছলনাময়ী হতে বাধ্য। আর সেই ছলনার মুখোশ আমাদের উৎপাতের থেকে বাঁচবার জন্যে। ছলাকলা দিয়ে হিংস্র নারীখাদক পুরুষের নখর দন্ত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করে ওরা।

কবি ও উপন্যাসিকরা যাই বলুন মেয়েদের আর সব স্বভাবের চেয়েও ছলনাই ওদের একমাত্র রক্ষাকবচ।

লছমীর উপচে পড়া যৌবন আমাদের আকর্ষণ করেছিল আর ওর চরিত্রের দৃঢ়তা আমাদের মনের শ্রদ্ধা কেড়ে নিল।

কিন্তু লছমীর চরিত্রের গুণ যাই থাক না কেন ওর ভাগ্য চিরকালই ওর প্রতি বিরূপ।

লছমীর ছেলেটা বাঁচল না। রাত্রি শেষ হওয়ার আগে সে তার শেষ নিশ্বাস ছাড়ল।

লছমী কান্নাকাটি করেনি। স্টোন ট্রেনের পাথরের মতই শক্ত হয়ে ছেলের সৎকারের কাজ শেষ করল। লছমীর ছেলে ঐ কোয়ারীর কোলে, হিমালয়ের ছায়ায় আর পাঁচটা পাথরের মতই চিরতরে ঘুমিয়ে রইল।

কিন্তু সেই রাত থেকে লছমীও অন্তর্হিত হল। লছমীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। বহু খোঁজাখুঁজি করেও জীবিতা বা মৃতা কোন লছমীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

কেউ কেউ বলল, বাঘে নিয়ে গেছে ওকে। ওতো পাগলের মত হয়েছিল। সম্ভবতঃ কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে ওকে বাঘে তুলে নিয়ে গেছে।

আমি ভাবছিলাম : প্রথমে লছমী বাঁচতে চেয়েছিল তার ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে। আর লছমী পরে ছেলেকে বাঁচাতে চেয়েছিল নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ছেলেও বাঁচল না, লছমী নিজেও বাঁচল না।

এদিকে আমাদের স্টোন ট্রেন সম্পূর্ণ লোড হয়ে গেছল। একদিন আবার ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের লোকজনেরা এল। এবার দুজন অফিসার এবং অনেকগুলো কর্ম্মচারী। প্রতিটি ট্রাকে পাথরের পরিমাপ করা হয়েছিল আগেই। সাহেবরা গাড়ীর পাথর বোঝাই-এর সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

আমরা গার্ড হিসাবে চালানগুলোর একটা করে প্রতিলিপি বা কপি পেলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখলাম চালানগুলোতে মাপ যা বসানো আছে তার সাথে গাড়ীর আসল মাপের বেশ তফাৎ আছে।

প্রসাদের উপদেশ আমার মনে আছে। আর যখন বড় বড় অফিসারেরা চেক্ করে ওটা মেনে নিলেন তখন নিশ্চই ঐটাই নিয়ম। সুতরাং আমি কিছুই বুঝলাম না বা বুঝতে চেষ্টা করলাম না।

স্টোন ট্রেন দীর্ঘ দেড় মাস পরে নড়ে উঠলো। বাঘের জঙ্গল, চা বাগানের স্নানরতা সুন্দরী, হিমালয়ের সুন্দর উপত্যকা, সব ছেড়ে আমরা যাত্রা করলাম। পেছনে রেখে এলাম লছমী আর তার ছেলে রাজকুমারের স্মৃতি।

গাড়ী স্টার্ট দিলে প্রসাদ বললে, 'মংরুটা খুবই মুষড়ে পড়েছে। ও লছমীকে সত্যিই খুব ভালবাসত।'

আমি বললাম, 'বাঁশী বাজান লোকগুলো খুবই ভাবপ্রবণ হয়। আর ওতো হয়েছিল রাখাল রাজা।'

বকসা রোডে এসে কিছুক্ষণ থাকতে হল।

মংরু আমাদের ব্রেক ভ্যানের কাছে এসে ডাকল, 'গার্ড সাহেব' ওকে গাড়ীতে তুললাম। ও মেঝেতে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

ওকে কি বলে সান্ত্বনা দিব। চুপ চাপ থাকলাম।

মংরুর কাছে লছমীর কথা আরও জানতে পারলাম। লছমীর কাহিনীতে লছমী এই অধ্যায়টা আমাদের কাছে বলেনি। হয়তো ওটা বলার দরকার মনে করেনি।

লছমী ওর বাপের বাড়ী থেকে ওর এক মাসতুতো বোনের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। বোন বিবাহিতা, তার তিনটে ছেলেমেয়ে, অবস্থা তাদেরও খুব একটা খারাপ নয়। বোনের নাম সরস্বতী।

সরস্বতীর স্বামী কিন্তু ছিল অত্যন্ত চরিত্রবান লোক। শুধু দৈনিক একটু দেশী মদ না হলে চলত না। দেশী মদের প্রেরণায় তার স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার করতো। অন্য মেয়েছেলে পেলে তাদেরও ছেড়ে কথা বলতো না। নিজের স্ত্রী ছাড়া পৃথিবীর আর সব মেয়ে মানুষই ছিল তার কাছে আকর্ষনীয়।

এ হেন বোন ভগ্নিপতির বাড়ীতে যখন সে হাজির হল তখন সেই ভগ্নিপতির ভালবাসা পেতে তার খুব কষ্ট করতে হল না। তারপর সদ্য স্বামীহারা অসহায়া যুবতী। সুতরাং ওকে নিজের করে রাখতে তার প্রাণটা আকুলি বিকুলি করতে লাগল।

সন্ধ্যে হতেই বেশ খানিকটা দেশী মাল গলাধঃকরন করে এসে নিজের ঘরে হাজির হল। এত সকালে যে স্বামী কোন দিনই আসে না, তাকে আসতে দেখে সরস্বতী বুঝলো আজ একটা গুরুতর কাণ্ড হবে।

ঘরে ঢুকেই লছমীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আও মেরে পেয়ারী শালী, হামারা কলিজা ঠাণ্ডা করো।'

লছমীর আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো। সরস্বতী এসে লছমীর

সামনে দাঁড়াল। স্বামীকে ভৎর্সনা করে বলল, 'কিয়া বোলতে হো, তুমকো তো হোঁশ নাহি হ্যায়। উসকো পতি মরা হুয়া আজ এক মাহিনা ভি নাহি হুয়া।'

'আরে চলো উ শালা মর গিয়া তো আচ্ছাই হুয়া। উ নাহি মরতা তো লছমী মেরে পাশ আতা কেইসে ?' ওর নেশাময় যুক্তি শুনে লছমী থ হয়ে গেল।

লছমীর দিকে এক পা এগুতেই লছমী ফুঁসে উঠলো 'খবরদার।'

ওকে রুখে দাঁড়াতে দেখে ভগ্নীপতি গণৌরীলাল আশ্চর্য্য হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'আরে ভাই হাম তো আচ্ছা বাত বোলা। মেরা এক সরস্বতী হ্যায় ঔর তুমকো শাদী করকে লছমীভি মিলেগা। দোনো খুব সুরৎ বিবি রহেগা তো সব কোই তাজ্জব হো যায়গা।'

মাতালের কথায় লছমী হাঁসবে না কাঁদবে বুঝতে পারে না।

চৌকির উপর বসে লোকটা নিজের মনে একটা সিনেমার গানের কলি গাইতে থাকে বেসুরো কণ্ঠে, 'রাত ভরি রহিও, সাবেরে চলে যাইও'।

তারপর হঠাৎ বলে লছমীর দিকে চেয়ে 'দেখ লছমী হামারা বাত হাথী কা দাঁত। হামসে তেরা শাদী জরুর হোগা। তেরা এক পতি মিল যায়েগা ঔর তেরা বাচ্চাকো, বাপ। লেকিন হাম আজ ভর তুঝে সোঁচনেকা মৌকা দে'তা। কালতক বতা দেনা।'

লোকটা আবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। সমব্যথী দুই বোন নিজেদের ভাগ্যের উপর সব ভার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে কাঁদতে বসলো।

সেই রাত্রে লছমী স্বপ্নে স্বামীকে দেখল। মুখটা তার বড় করুণ। লছমীকে বলল, 'লছমী আমি বহু দূরে আছি। কিন্তু তোমাকে সব সময় চোখে চোখে রেখেছি। তোমার বিপদ সহ্য করতে পারছি না।'

তারপর লছমীকে বুকে টেনে নিয়ে বলল, 'তোর খুব বিপদ এখানে লছমী, তুই পালা, এখান থেকে পালিয়ে যা।'

ব্যাস স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। গাটা প্রথমে ছম্-ছম করে উঠলো পরমুহূর্ত্তে ছেলেটাকে কোলে চেপে ধরে নিজেকে ধিক্কার দিল, ছিঃ ছিঃ স্বামীকে সে ভয় পাচ্ছে তার তুচ্ছ জীবনের জন্যে।

সেই রাত্রেই লছমী ভগ্নীপতির গৃহ ত্যাগ করল। সেখান থেকে এক রেল স্টেশনে বসে থাকার সময় ঐ কুলিসর্দ্দারের সঙ্গে দেখা।

মংরুর গল্প শুনতে শুনতে আমাদের গাড়ী এর মধ্যে বক্সা রোড ছেড়ে রাজাভাতখাওয়া জংসনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

মংরু খুব দুঃখ পেয়েছে। লছমীকে ও পেতে চেয়েছিল, লছমীও মাংরুকে ভালবেসেছিল। কিন্তু মাংরুকে নিজের জীবনের সব কাহিনী বলে ও বুঝিয়েছিল যে যতদিন বাঁচবে নিজের স্বামীর স্মৃতিকে আঁকরে ধরেই, বাঁচতে চায়। স্বামীর স্থান ও আর কাউকে দিতে পারবে না।

মাংরুও অতএব ওকে আর কোনরকম অনুরোধ করেনি। নিঃশব্দে ভালবেসে গিয়েছে।

মংরু কিন্তু একটা কথা বলল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, লছমী মরেনি। লছমী পালিয়ে গেছে। লছমী ঠিকাদারের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে ঐ বিপদসঙ্কুল অরণ্যের মাঝখান দিয়ে পথ খুঁজে নিয়েছে।

গাড়ী যখন রাজাভাতখাওয়া এল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। বলতে কি আমাদের মনটা লছমীর অন্তর্ধান সম্পর্কে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল।

এদিকে আমাদের গাড়ী রাজাভাতখাওয়া ছেড়ে গন্তব্যস্থলের দিকে এগুচ্ছে। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে রেল কোম্পানীর নির্দ্দেশমত এক একটা ট্রাক খালাশ হতে লাগল।

কেশরীমল সঙ্গেই আছে। একদিন কথাপ্রসঙ্গে কেশরীমলকে প্রশ্ন করতেই ও রেগে উঠলো। চোখ দুটো প্রতিহিংসার আগুনে জলজ্বল করে উঠলো।

ঠিকাদার বলল, 'আরে বাবু লছমী বহুৎ বেইমান ঔরৎ আছে।' আমরা কোন উত্তর দিলাম না।

ঠিকাদার আবার বলল, 'যো দিন ওর লেড়কা মারা গেল ঐদিন রাতে লছমী হামার ঘরে আসিয়ে বলল, বাবু হমাকে কুছ হিসাবের রুপিয়া দেন। হামি ভি বিশওয়াস করে ও'কে রুপিয়া দিলাম। ব্যাস! যাদা রুপিয়া লিয়ে ভেগে গেল।'

কেশরীমল চলে যেতেই প্রসাদ বলল, 'কিছু একটা ব্যাপার আছে বুঝলে। ঠিকাদার অত সহজ চীজ নয়। টাকা ওকে এমনি দেনে-বালা লোক নয় কেশরীমল।'

আমি বললাম, 'কিন্তু ও টাকা চাইবেই বা কেন ওরকম ভাবে আর কেশরীমল বেশী টাকা দিলই বা কেন। আর সেই টাকা নিয়ে সে পালিয়ে গেল কেন। আমার কি মনে হয় জানো?'

প্রসাদ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল।

আমি বললাম, 'মনে হয় ঠিকাদার ওকে জোর করে ওর ক্ষতি করেছে। তারপর নিজের কীর্তিকলাপ প্রকাশ হওয়ার ভয়ে ওকে—

প্রসাদ আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'খুন করে ওর লাশ সরিয়ে ফেলেছে এইতো?

আমি মাথ নেড়ে সায় দিলাম।

প্রসাদ বলল, 'না এটা ঠিক নয় কারণ কেশরীমল আর যাই করুক না কেন, খুন খারাপীর মধ্যে যাবে না।'

ব্যাপারটার উপর কিছুটা আলোকপাত করলকুলি সর্দার বালাজী।

আমাদের স্টোন ট্রেন যেখান থেকে যাত্রা সুরু করেছিল সেই খানেই ফিরে এসেছে তখন। সেই গিতালদা স্টেশনে। এখানে আনলোডিং হয়ে গেলেই গাড়ীটার কাজ শেষ। আমরা কাগজপত্রের কাজ শেষ করে ফিরে যাব স্বস্থানে।

যাওয়ার সময় গিতালদহে বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি, ফিরতি যাত্রায় কিন্তু এক সপ্তাহ লেগে যাচ্ছে।

দুই বন্ধুতে মনের সুখে ঘুরে বেড়াই কাজ হয়ে গেলে। বাড়ী ফেরার আশায় আমরা ব্যাকুল। দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকে ঘরের বউ-এর জন্যে সত্যি মন কাতর হয়েছে।

সেদিন বাঙ্গাজীর সঙ্গে দেখা হল নদীর ধারে।

নিরিবিলি দেখা হওয়া মাত্র প্রসাদ ওকে ধরল, 'আরে সর্দ্দার তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।'

সর্দ্দারকে বেশ কায়দা করে প্রসাদ বলে, 'দেখ সর্দ্দার আর তো ক'য় রোজ আছি আমরা। আমাদের একটা সত্যি কথা বলবে?'

সর্দ্দার ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে প্রসাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল। প্রসাদ আবার বলল, 'সর্দ্দার লছমীর হঠাৎ কি হল? ও কি বেঁচে আছে না বাঘে খেয়েছে ওকে?'

সর্দ্দার আমাদের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। হয়তো ভাবল গার্ড বাবুদের লছমীর উপর এত দরদ কেন?

প্রসাদ ওকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলল, 'দেখ সর্দ্দার আর তিন চার দিনের মধ্যেই আমরা কে কোথায় চলে যাব। যদি তুমি কিছু জান আমাদের বল।'

সর্দ্দার মুখ নিচু করে বলল, 'ছোড়েন বাবু উসব ঔরৎকে বাত। উ সব ফালতু মেয়েছেলেদের কথায় আপনাদের মত সরিফ আদমীদের না থাকাই ভাল।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'আমরা তো থাকতে যাচ্ছি না। আমরা শুধু জানতে চাই।'

সর্দ্দার এবার বলল, 'যে রোজ লছমীকে বেটা মর্ গেল উসি সাঁঝ কো উহ বহুৎ সাজ গোজ করিয়ে ঠিকাদারের কাছে গিয়ে বলল যে উহ—ছোড়িয়ে বাবু উসব বাত—

সর্দ্দারের সঙ্কোচ দেখে প্রসাদ বলল, 'তোমার কোন চিন্তা নাই আমরা কারুকে এ কথা বলব না।'

সর্দ্দার এবার বলতে সুরু করল, 'বহুত সাজ করিয়ে লছমী

ঠিকাদারকে বলল যে উ ঠিকাদারের সঙ্গে রাতভর থাকবে। লেকিন তার পহলে উসকো সব হিসাবের পয়সা দিতে হবে। ঠিকাদার তো বাবু বহুৎ খুশী হল। উসকো সমুচা পয়সা কিলিয়ার করে দিল। উপর সে ওর বিশরুপিয়া বখ্শিস্। রাত তো পার হোয়ে গেল লেকিন লছমী আসে না। আখির ঠিকাদার সাহেব হামাকে ভেজলো উয়ার কোঠরীতে। হামি গিয়ে দেখলাম উ ভেগে গিয়েছে।'

প্রসাদ বলল, 'কিন্তু বাঘেও তো নিয়ে যেতে পারে?'

'না বাবু বাঘ লিয়ে যায় নি।' সর্দ্দারের পরিষ্কার, বিশ্বাস, 'হামরা বহুৎ তলাশ করিয়েছি বাঘে অগর লিবে তো উসকা কাপড়া-লত্তা তো জরুর মিলবে।'

অর্থাৎ বোঝা গেল কুলিসর্দ্দার বালাজীও লছমীর মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করে না। ঠিকাদার কেশরীমলও করে না, করে না আর কেউ-ই।

এর পরে লছমীর সঙ্গে আমাদের কোন দিনই দেখা হয়নি; কয়েক দিনের মধ্যেই স্টোন ট্রেনের যাবতীয় কাজ শেষ হয়ে গেল।

আমারা আবার দীর্ঘদিন বাদে গিতালদহ থেকে স্পেয়ার হয়ে আমাদের পুরনো কর্মস্থলে ফিরে এসে কাজে জয়েন করলাম।

আমার গল্প শেষ হতে বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা বাজল। গল্পটার এই রহস্যময় পরিস্থিতি আমার শ্রোতাদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন তুললো।

আমার নিতাইপদকে যতই বোকা মনে হোক ও কিন্তু একটা রামচালাক। ও বলল, 'তা হলে ঐ লছমীর সঙ্গেই আপনার এতদিন পরে দেখা হল, ঐ কয়লাওয়ালী বুড়িটা?'

আমি সোৎসাহে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললাম, 'ঠিক ধরেছ ঐ বুড়িটাই হল লছমী। একদিনের সেই চোখ ধাঁধাঁনো রূপসী লছমী আজ তার যৌবন হারিয়ে কয়লাবালী বুড়ি হয়েছে।'

'তা হলে গার্ড সাহেব ওর সঙ্গে ঐ ছেলেমেয়েগুলি?' নিতাই

পাকা গোয়েন্দার মত প্রশ্ন করে। 'আপনি তো বললেন ও আর বিয়ে করেনি কাউকে তা হলে?'

আমি বললাম, 'ও পরে বিয়ে করেছে। করতে বাধ্য হয়েছে, সেই কথাই ওর কাছে শুনছিলাম।'

নরেশ হঠাৎ হাঁক দিল, 'ঠাকুর চা আর খাবার দাও আমাদের।' তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে বলল, 'আজ আর কারও ঘুমিয়ে দরকার নেই। বেলা চারটে প্রায় বাজে।'

সকলের নাইট ডিউটি করা, তার উপর সারা দুপুর গল্প করে কেটেছে সুতরাং চোখ কট্ কট্ করছে, জ্বালা করছে। তা ছাড়া আজকের রাতটাও নাইট ডিউটি দিতে হবে। সমস্ত ট্রেনটাকে ফিজিক্যালি এবং মেণ্টালি পাহারা দিয়ে পেঁাছে দিতে হবে। আমরা রেলের গার্ড। ওরকম পর পর বহুদিন রাত জাগা আমাদের অভ্যাস আছে।

রেল কোম্পানীর খাতা কলমে সুযোগ সুবিধা দিয়ে অনেক আইন কানুনের গল্প লেখা আছে। কিন্তু ঐ সব আইনমাফিক কাজ করতে গেলে তো রেলের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে। জনসাধারণের কষ্ট হবে এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ আইনমাফিক কাজ করার বিরুদ্ধে।

যাই হোক ঠাকুর গরম চা সাপ্লাই করা মাত্র সকলেই চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

গার্ড টি. পি. মজুমদার বলল, 'বাকিটা বলে ফেলুন। হিন্দি ছবির মত সাস্‌পেন্স সৃষ্টি করার চেষ্টা ছাড়ুন।'

নিতাই একটু মুচকি হেসে বলল, 'তা যাই বলুন বুড়ি এখনো বেশ ডাগড়াই আছে।'

লছমীর কাছ থেকে যা শুনেছিলাম বস্কা রোড থেকে ওর অন্তর্ধান থেকে বাকি জীবনের কথা আবার ওর জবানীতে বাংলা ভাষায় বলতে লাগলাম।

॥ চৌদ্দ ॥

ছেলেটা আমার মরে গেল। আমি কিন্তু কোন সময় এতটুকুও আশঙ্কা করিনি যে আমার একমাত্র ছেলে মরে যাবে।

তোরা আগের দিন আমাকে আশা দিয়ে গেলি। আমি সে কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। আমার স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষমানুষকে আমি ওরকম বিশ্বাস করিনি। তোদেরকে শ্রদ্ধাভক্তি করেছিলাম!

তার কারণ মেয়েরা পুরুষদের চোখের দৃষ্টি দেখলেই সব বুঝতে পারে। তোদের দেখে বুঝেছিলাম, তোদের দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হতে পারে না। তোরা সরিফ, তোরা শিক্ষিত।

আরেকটি লোক ছিল, তাকেও ভাল লেগেছিল। সে হল মংরু। মংরু আমায় চেয়েছিল। মনেপ্রাণে ভালবেসেছিল। স্বামীর স্মৃতি যদি আমার অন্তরের গভীরে প্রোথিত হয়ে না থাকতো তাহলে মংরুকে বিয়ে করে আমি ঘর বাঁধতাম। ও আমার জন্যে আত্মত্যাগ করত।

চেয়েছিল আমার ঠিকাদার কেশরীমলও। কিন্তু ও চেয়েছিল কয়েকদিনের জন্যে। ওর উত্তপ্ত নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলো, আমার সহবাসে খানিক তাতিয়ে নিতে চেয়েছিল। তার জন্যে ও কিন্তু পয়সা খরচ করতে চেয়েছিল। অর্থ বিলিয়ে দেওয়া আর হৃদয় বিলানো দুটোর মধ্যে কিন্তু অনেক প্রভেদ। হৃদয় অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। যার অর্থ আছে প্রচুর, হৃদয়ে সে নিঃস্ব।

আমি যেদিন ভিজে কাপড়ে স্নান করে তোদের সামনে পড়েছিলাম, মিহি মিলের শাড়ী জলে ভিজে, স্বচ্ছ হয়ে আমাকে নিরাবরণ করে তুলেছিল। প্রথমটা তোদের সামনে ঐরকম উলঙ্গ-প্রায় পোশাকে, লজ্জায় আমার সর্বশরীর কাঁপছিল। কিন্তু তোদের চোখে চোখ পড়তেই দেখলাম তোরা আরও লজ্জা পেয়েছিস। আমার মত একটা যৌবনসর্বস্ব মেয়ের উদ্ধত যৌবন সম্ভার তোদের লজ্জা

দিচ্ছিল। সেদিনই বুঝলাম তোরাই প্রকৃত পুরুষ। তোদের কাছে হয়তো তাই আমার লজ্জাও প্রকট হয়ে উঠেছিল। লজ্জা যে পায় সেইত লজ্জার মর্ম বোঝে। তোরা মেয়েদের শুধু ভোগ করার কথাই ভাবিস না, তোরা মেয়েদের সম্মানও করিস।

সেইদিন যখন তোরা বললি, আমার ছেলে বাঁচবে তখন তাই অবিশ্বাস করতে পারিনি!

মংরু কিন্তু আমার জন্যে অনেক করেছে। ওকে বিয়ে করতে পারিনি সেটা আমার দুর্ভাগ্য। কিন্তু ওকে আমি ভালবেসেছিলাম।

আমি জানতাম এখানে বেশীদিন আমার অন্ন নেই। শুধু ছেলেটার জন্যে কিছু রোজগার করতে হবে এই আশায় যেতে পারিনি। সেই সঙ্গে এটাও বুঝেছিলাম কেশরীমল তার ইজ্জতের ব্যাপারে খুবই সচেতন। সে জবরদস্তি করতে পারবে না। আমার প্রতি তার যে কামনা আছে তা চরিতার্থ করবার জন্যে গোপনে চেষ্টা চালিয়ে যাবে। আমি এও জানতাম যে যেদিন থেকে গাড়ী এসেছে, চামিলী ওর বাসনায় ইন্ধন যোগিয়েছে।

হঠাৎ একদিন রাত্রে সর্দার এল আমার কাছে, কেশরীমলের দূত হয়ে। আমাকে অনেক বোঝাল। আমি রাণী হয়ে যাব। আমায় সোনার বালা কিনে দেবে। অনেক টাকাপয়সা দেবে ইত্যাদি।

আমি কিছুতেই রাজী নই। কেশরীমলকেই যদি মেনে নেব তাহলে কারখানায় ফোরম্যান কি দোষ করেছিল, ফোরম্যানের কাছে নিজেকে বাঁধা দিলে তো আমার স্বামীর মৃত্যু হত না। যে যাই বলুক না কেন আমার স্বামীর মৃত্যু তো কোন দুর্ঘটনায় হয়নি। তার মৃত্যু হয়েছিল সুপরিকল্পিত উপায়ে এক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে।

আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম। এ হতে পারে না। যে অমূল্য সম্পদ রক্ষার জন্যে আমার স্বামী জীবন দিতে পারে, তাকে আমি যে-কোন মূল্যে রক্ষা করব।

সর্দার নানারকম ভাবে চেষ্টা করল। কাজ শেষ হলেই আমাকে

ঠিকাদার লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। সর্দার আমাকে নিয়ে এসে সুপারিশ করে চাকরী দিয়েছে তার প্রতিও তো আমার কর্তব্য কিছু আছে।

কিন্তু হোল না ওদের কার্যোদ্ধার। আমিও প্রস্তুত হলাম যে এই কাজ শেষ হলেই এদের সান্নিধ্য ত্যাগ করব।

এদিকে খুব অর্থকষ্টেও পড়লাম। ছেলেটার খুব অসুখ হল। খোরাকির টাকা সর্দার যা দেয় তাতে একেবারেই কুলোয় না। বুঝলাম, এইভাবে ঠিকাদার আমার উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

ঠিকাদারের কাছে অনেক পাওনা হয়ে গেল। অন্য মজুরদের টাকা অত বাকি থাকে না। শুধু আমার বেলাই ঠিকাদারের এই ব্যবহার।

যেদিন বৃষ্টির মধ্যে তোরা এসে আমার কামরায় আশ্রয় নিলি তার আগের দিন রাত্রে ঠিকাদারের কামরায় গেলাম। চাইলাম আমার পাওনা টাকা।

ঠিকাদার ওর ক্রূর দৃষ্টিতে ঐ আবছা আলোর মধ্যে আমার সমস্ত শরীর জরীপ করতে করতে বলল, 'তোমাহারা রুপাইয়া? জরুর মিলেগা ঔর যিয়াদা মিলেগা, বহুৎ রুপিয়া মিলেগা মেরি জান!

আমার সমস্ত শরীর রাগে, ঘৃণায় রি-রি করে উঠলো। আমার মত একজন দরীদ্র বিধবা। যার ছেলে মৃত্যুশয্যায়। সে যখন তার রক্তজলকরা পরিশ্রমের টাকা চাইতে গেছে তখন তাকে ঐ কুপ্রস্তাব!

সেই চোখে লোভী হায়েনার দৃষ্টি দেখে আমি শিউরে উঠলাম! কোনক্রমে আমি ওর সাজানো কামরা থেকে পালিয়ে এলাম।

নিজের ঘরে এসে খুব কাঁদলাম। কেঁদে কেঁদে মনটা অনেক হালকা হল। ভাবলাম, ছেলেটাকে আমার বাঁচাতেই হবে। বাবু, তোরা যে ওষুধ দিয়েছিলি সেই ওষুধ খাইয়ে নিজের কলিজা ধরে বসে, সারারাত বিনিদ্রভাবে কাটিয়েছিলাম!

পরদিন সকালে আমার কাছে একটা পয়সাও নেই। তোরা এলি। ডাক্তারের কাছে যেতে বললি যখন, আমার মাথায় আকাশ

ভেঙ্গে পড়ল। ডাক্তার দেখাতেও তো পয়সার দরকার। মংরু হয়তো কিছু দিতে পারে। কিন্তু মংরুর উপরও ভরসা করতে পারছি না। ওর অবস্থাও তো ঠিকাদার আমারই মত করে রেখেছে।

যাই হোক ঠিকাদার নিজেই টাকা বার করে দিল। আমার আর কারুর কাছেই চাইতে হল না।

কিন্তু এত, সব সত্ত্বেও ছেলেটা আমার বাঁচলো না! আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল। আমার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল।

আমিও মনস্থির করে ফেললাম। যে বন্ধনের জন্যে ঠিকাদার আমায় স্থানুর মত করে রেখেছে, সে যখন নেই তখন আমার এখানে থাকার কোন অর্থই হয় না। আমি চলে যাব। তবে যাওয়ার আগে ঠিকাদারের কাছে পাই পয়সা আদায় করে নিতে হবে।

আবার মনে এ চিন্তাও এল ঠিকাদার তো সাধু সন্ন্যাসী নয় যে চাইবামাত্র আমায় আপ্যায়ন করে বলবে, 'এস তোমার সমস্ত পাওনা গণ্ডা নিয়ে যাও। তুমি খুব কষ্টে আছ: তোমার দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছি না।'

তারও ব্যবস্থা করলাম। সন্ধ্যা হতেই খুব সাজসজ্জা করলাম। স্বামীর মৃত্যুর পর এই প্রথম আমি সাজতে বসলাম। আমি জানি আমার রূপ আছে। সেই অস্ত্র যথাসম্ভব শানিয়ে নিয়ে হাজির হলাম ঠিকাদারের মেহফিলে।

মুখে ভালবাসার রঙ মাখিয়ে, মনলোভা অঙ্গভঙ্গীর অলঙ্কারে নিজেকে সাজিয়ে ঠিকাদারের গাড়ীতে যেতেই লোকটা প্রথমে হকচকিয়ে গেল। আমার উপস্থিতিতে ও হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত জিনিস পাওয়ার আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। লোভে ওর চোখ দুটো চকচক করে উঠেলো। ও আমাকে খুব খাতির করে বলল, 'হাম জানতা থা লছমী, একরোজ তুম জরুর আপনা গলতি সমঝ যায়েগি। বৈঠো, বৈঠো।'

আমি বসলাম। কার্যোদ্ধারের জন্যে আমাকে বসতে তো

হবেই। আমি মুখে মৃদু হাঁসি মাখিয়ে বললাম, 'মুঝে মাপ কর দিজিয়ে, ম্যায় আপনা বাচ্চাকে লিয়ে এতনা রোজ বহুৎ দুঃখ মে থী।'

ঠিকাদার খুব সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, 'মুঝে বহুৎ আফশোস্ হ্যায় কি তোমহারা বাচ্চা জিন্দা নাহি রহা। খ্যার আভি দুঃখ পানেসে কিয়া ফয়দা হ্যায়, আভিতো জিনে হোগা। জিন্দেগি বহুৎ লম্বা হ্যায়।'

আমি একটু আবদার করার ভঙ্গিতে বললাম, 'ম্যায় ভি জীবন চাহাতহুঁ, আপ থোড়া মুঝে মদৎ দিজিয়ে।'

ঠিকাদার একেবারে গলে গেল, ওর চোখে মুখে উল্লাস একেবারে ফেটে পড়ছে। ও বলল, 'তুম মেরা হো যাও, ম্যায় তুমকো সমুচা দুঃখ হটা দুঙ্গা।'

আমি চাপা স্বরে বললাম, 'হাম তো আপকি নোকরানী হু, যো হুকুম কিজিয়েগা ওহি মান লুঙ্গি।'

ঠিকাদার নেশার ঘোরে উঠে দাঁড়াল, আমার সামনে এসে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'নাহি, তোম মেরা নোকরানী নাহি, মেরা রাণী হো, রাণী।'

ঠিকাদার দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ওর হাতের স্পর্শে আমার সারা অঙ্গে যেন ফোস্কা পড়ে যেতে লাগল! ওর হাত একটু বেয়াড়া হয়ে উঠতেই আমি নিজেকে ওর বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত করলাম।

ও আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেয়া হুয়া ?'

আমি গলায় মধু ঢেলে বললাম, 'বাবু হামারা কুছ রুপিয়াকো বহুত জরুরত হ্যায়, আপ মুঝে কুছ রুপিয়া জরুর দেঙ্গে না।'

মনের মেয়েছেলেকে বশীভূত করতে পারলে পুরুষরা দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কেমন যেন বোকা হয়ে যায়—

আমার কথার উত্তরে বলল, 'আভি চাহিয়ে, কেতনা রুপিয়া

চাহিয়ে বোল।' আমি বললাম, 'থোয়াসে, হামরা যেতনা হিসাব কা হোতা, উৎনাহি।

'তো লে লো, আভি লে লো।' তড়িঘড়ি আমাকে ছেড়ে উঠলো তারপর একটা জামার পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে রাখল আমার কোলের উপর, বলল, 'আব খুশ হো, ইয়া নাহি।

আমি দেখলাম আমার প্রাপ্য অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশী টাকা সেখানে আছে। ঠিকাদার আবার আমাকে দুই হাত বাড়িয়ে ধরতে এল। আমি তাকে এড়িয়ে ফিস ফিস করে বললাম, 'আভি নাহি বাবুজি, থোড়া ঔর রাত বড়নে দিজিয়ে, সব কোইকে সো জানে দিজিয়ে, ম্যায় আযাউঙ্গি চুপকিসে ঔর রাতভর আপকো সিনেসে লগকর রহুঙ্গি।'

ঠিকাদার চমৎকৃত হয়ে বলল, 'বাঃ, ঠিক্ বাত বোলা তুম। থোড়া রাতমে আনাহি ঠিক হ্যায়, নাহি তো হাম দোনকা বদনামী হোগি।'

আমি টাকাটা নিয়ে নিজের কুঠিতে ফিরেই অল্প সময়ের মধ্যে নিজের যাবতীয় জিনিসপত্র পৌটলা করে বেঁধে নিলাম। ছেলের স্মৃতি বলতে একমাত্র মাতুলী ঐ পৌটলার মধ্যে রেখে, আমি ঐ অভিশপ্ত বাসস্থান ছেড়ে, কপাল ঠুকে রওনা হলাম।

আমার প্রাপ্য টাকার চেয়েও বেশী টাকা পাওয়ার দরুণ আতঙ্কে আমার শরীর ও মন দুই-ই খুব অস্থির হয়ে পড়েছিল। খালি মনে হচ্ছিল যে ঐ পাপপুরী থেকে যত দূরে সরে যেতে পারি ততই মঙ্গল।

বাঘ ভালুক কারুর ভয়েই সেদিন আমি আমার গতি রুদ্ধ করতে পারিনি। যে জঙ্গলে মালগাড়ী ছেড়ে রাত্রে বে'র হতে পারতাম না সেই গহন বনের মধ্যে দিয়ে রাতের অন্ধকারে একা আমি যে কি নেশার ঘোরে ছুটেছিলাম আজও তা ভাবতে পারি না।

প্রকৃতই সেদিন আমার মন বলে কোন বস্তু ছিল না। স্বাভাবিক জ্ঞান হয়েছিল অন্তর্হিত।

রেল লাইন ধরে ছুটে চলছিলাম। সারা রাত চলে হঠাৎ

আকাশে উষার আলোর আভাস দেখতে পেলাম। অনেকের কাছে দিন আসে নূতন আশার আলো নিয়ে কিন্তু আমার কাছে দিন এসেছিল নূতন আতঙ্কের পসরা নিয়ে। রেল লাইন ছেড়ে আমি বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

আমি চলছি। অনাহারে, অনিদ্রায় ক্লান্ত হয়ে ছুটে চলেছি। তবু রক্ষা যে বনরাজির মধ্যে প্রখর সূর্যকিরণ ছিল না। কিন্তু সব ক্ষমতারই একটা শেষ আছে। আমি আর পরছিলাম না। আমার শরীরটাকে মনে হল ভীষণ ভারী। মনে হল শরীরটা আমার নয়। আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছিল। শেষকালে আর হল না। পারলাম না। সমস্ত কিছুর সঙ্গে, সব শেষে আমার জ্ঞান হারিয়ে ঐ জঙ্গলের মধ্যে লুটিয়ে পড়লাম।

যখন আমার জ্ঞান হল, দেখলাম আমি একটা ঘরে শুয়ে আছি একটা খাটিয়ার উপর। ঘরে একজন বয়স্কা মেয়ে। আমাদের দেশী মেয়েছেলে। কিন্তু সাজপোশাক অনেক ভাল।

আমার জ্ঞান হতে দেখে, আমাকে খুব স্নেহের সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?'

আমি মাথা নাড়লাম।

ও বলল, 'তুমি শুয়ে থাক, আমি মেম সাহেবকে খবর দি।'

আমি কিছু বললাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই মেয়েটি যাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল সে একেবারে খাঁটি মেমসাহেব। লাল টুকটুকে রং। মাথার চুলের অনেকগুলোতেই সাদা রঙ ধরেছে। শরীরটা একটু স্থূল হলেও বেশ ডাঁটালো।

প্রথমেই আমাকে ভাঙ্গা হিন্দিতে বলল, 'বেটী কোন চিন্তা কোরো না। এখানে তুমি ভাল হয়ে যাবে।' মেম সাহেব আমার বিছানায় কিন্তু বসল না। আমাকে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বিদায় নিল।

॥ পনের ॥

ক্রমে আমি সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম। আমি জানতে পারলাম, আমি একজন ফরেষ্টারের কোয়ার্টারে আছি। আমার দেশোয়ালী ঐ মেয়েছেলেটি মেম সাহেবের খাশ্ আয়া।

মেম সাহেব ও সাহেব তুজনেই খুব ভাল লোক। সাহেবরা যে এত ভাল হয় আমি জানতাম না।

সাহেব বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একসময় আমার অচেতন শরীরটাকে দেখতে পেয়ে, তুলে বাড়ি নিয়ে আসেন। আমি সম্পূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টা অচেতন ছিলাম।

সাহেব ও মেম সাহেব তুজনেই অত্যন্ত মহৎ লোক। তাঁদের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। ফলে আমাকে তারা খুব ভালবাসতেন, আমি মেম সাহেবের বাড়ীতেই থাকলাম। সবসময় তার ফাই ফরমাইস খাটতাম আমার কোন বেতন ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে মেম সাহেব আমাকে পয়সা কড়ি দিতেন। সোনার গহনা পর্যন্ত দিয়েছেন।

নিরাশ্রয়, অসহায় আমি একটা আশ্রয় পেলাম। ওখানে থাকতে পেয়ে কিছুদিনের মধ্যে আমি আরও সুন্দরী হয়ে উঠলাম।

আমার বিবাহিত জীবনের সুরু থেকে একটা জিনিস সর্বদা আমার প্রতি বিরূপ। তা হলো আমার ভাগ্য। আবার সেই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল আমার। মেম সাহেব আমাদের রেখে ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন।

মেম সাহেব মারা যেতে সাহেবকে সামলানো আমাদের পক্ষে হল বিরাট মুশকিল। প্রকৃতপক্ষে সাহেব শোকে একেবারে পাগল হয়ে উঠলেন।

একটা কানাঘুসা শুনতে পেলাম, সাহেব নাকি তার চাকরীতে

ইস্তফা দিয়ে নিজের দেশ বিলাতে চলে যাবেন। এদেশে তিনি আর থাকতে পারবেন না।

অবশেষে এই কানাঘুসা বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়ে দেখা দিল। সাহেব একদিন তাঁর খাশ কামরায় আমাকে তলব করলেন। আমি ভয়ে ভয়ে, দুরু দুরু বক্ষে সাহেবের কাছে হাজির হলাম!

সাহেব শান্তভাবে আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন! তারপর বললেন, 'লছমী আমি দেশে চলে যাচ্ছি। মেম সাহেব তোকে খুব ভালবাসতেন। তাই আমি ঠিক করেছি—উনি একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন যে, আমি ঠিক করেছি তোর বিয়ে দিয়ে যাব!'

আমি চমকে উঠলাম! কিন্তু কিছু বলতে সাহস হল না।

সাহেব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হয়তো আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'দেখ বেটী আমি না থাকলে তোর জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠবে। অল্পবয়সের মেয়েছেলে দুনিয়ায় বড় অসহায়! দরজায় দরজায় ঠোকর খেয়ে ঘুরে বেড়াবি!' তারপর খুব মিষ্টি করে বললেন, 'তুই আজকে চিন্তা কর, কাল আমাকে জানাবি।'

আমি চলে এলাম। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। নিজের ঘরে গিয়ে খুব কাঁদছি, এমন সময় আয়াদিদি এসে আমার মাথায় হাত দিয়ে কান্নার কারণ জানতে চাইল।

আমি বললে, আয়াদিদি বলল, 'সাহেব ঠিকই বলেছে লছমী! এই লোভী পুরুষগুলোকে তো চিনেছিস। অসহায়া, আশ্রয়হীনা যুবতী পেলে এরা শেয়াল কুকুরের মত ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করবে! তোর একটা শক্ত আশ্রয় দরকার।'

আমি উত্তরে কিছু বলতে চাইছিলাম কিন্তু আয়াদিদি বাধা দিয়ে বলল, 'তোর কথা আমি জানি কিন্তু তোর সামনে দীর্ঘ জীবন পড়ে আছে! এই বয়সে এভাবে থাকা তোর চলতে পারে না!'

হয়তো সাহেবের কথাই ঠিক কিন্তু মংরু কি দোষ করেছিল। আমি

যদি আবার বিয়েই করব তা হলে মংরুকে কেন আমি বঞ্চিত করলাম ? অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম আসে না।

কিন্তু একসময় ঘুম এল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বড় অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, সেই পাহাড়ের যে বড় পাথরটার উপর বসে থাকতিস তোরা, সেখানে আমার স্বামী বসে আছে। আমার স্বামী ওর উপরে বসে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। আর ঐ ঝর্ণার জলটা স্বামীর পা দুটো ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

আমি আমার স্বামীকে দেখে ছুটে গিয়ে তার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগলাম। আমার স্বামী বাঁশী বাজান বন্ধ করে আমার মুখটা তুলে ধরে বলল, 'আমি জানি লছমী তোর মাথার উপর দিয়ে কত ঝড় তুফান বয়ে গেছে।'

আমি স্বামীকে আমার বর্তমান সমস্যার কথা বললাম। স্বামী কেমন যেন গম্ভীরস্বরে আমার কথার উত্তর দিয়ে বলল, 'সাহেব তোর হিতাকাঙ্ক্ষী। সাহেব যা বলবে তাই শুনে চলবি। তাতে তোর ভাল হবে।'

আমি বললাম, 'সাহেব যে আমার বিয়ে দিতে চাইছে।' স্বামী আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, 'তুই বিয়ে করবি।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তোর জন্যে অপেক্ষা করব, আবার আগামী জন্মে আমাদের মিলন হবে।'

আমি কাঁদতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুঝলাম এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম।

ভোরের স্বপ্ন সফল হ'ল।

বেলায় সাহেব ডেকে পাঠালে, আমি বিয়েতে মত দিলাম। সাহেবেরই একজন খালাশীর সঙ্গে আমার বিয়ে হল। সাহেব বিয়েতে অনেক টাকা খরচা করে দেশে চলে গেলেন।

আমার বিয়ের পরে আমার স্বামী, (এঁর নাম শিউচরণ) আমার সমস্ত কথা শুনলো। আমিও সব বললাম অকপটে।

স্বামী আমাকে তবুও খুব ভালবেসেছে। এমনকি আমার প্রথম স্বামীর ছবিওয়ালা লকেটটি এখন পর্যন্ত আমার গলায় আছে। সে কোনো প্রতিবাদ করেনি।

তারপর ফরেস্টের কাজ থেকে শিউচরণের অবসর হল। নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শিলিগুড়িতে এলাম আমরা। আমাদের ছেলেমেয়ে অনেকগুলি। রিটায়ার হওয়ার পর টের পেলাম, সংসারে বড় অনটন।

আমার স্বামী বাজারে বাজারে সবজি বিক্রি করে। বড় ছেলেটা একটা রেস্তরায় বয়ের কাজ করে। এই আয়ে তো সংসার চলে না। তাই আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছাইগাদায় এই কয়লা বাছি।

না না বাবু, আমি খুব সুখে আছি। সারাদিন কয়লা বেচে আমি যা পাই, সকলে ভাগ করে মুখে তুলি। আর এখন জীবনের তো বেশী বাকি নেই। বয়স তো অনেক হল। লছমীর দীর্ঘ জীবনের শেষ প্রান্তে তো এসে পৌঁচেছি।

আমার সে যৌবনও নেই। তার দরকার নেই। জীবনের সমস্ত কাঁটার বেড়াজাল ভেদ করে যে ফুল এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল আজকে তা শুকিয়ে গিয়েছে—কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বৃন্ত থেকে ঝরে পড়বে। তারপর যাত্রা করব অনেক দূরে যেখানে আমার স্বামী আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

* * *

আমি এতক্ষণ তন্ময় হয়ে লছমীর গল্প বলছিলাম। এর মধ্যেই শ্রোতাদের অনেকেই ডিউটির প্রয়োজনে আসর ত্যাগ করে গেছে। আবার কিছু নূতন শ্রোতা যোগদান করেছে। গল্প শেষ হওয়ার পর সেটা লক্ষ্য করলাম।

সকলেই খুব শ্রান্ত। তাই সকলে চুপচাপ আছে। এমন সময় ডি, এন, ভাণ্ডারী বলল, 'গার্ড সাহেব একটা জিনিস কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করেন নি ওকে, ওর আসল স্বামী ভাল না নকল স্বামী।'

আমিও হেঁসে উত্তর দিলাম, 'জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ও বলল 'আসল আর নকল দুই ভাল— যদি দুই-ই নির্ভেজাল হয়।'